সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

গার্মেন্ট রপ্তানির টাকা যায় কোথায়?

অর্থ মন্ত্রণালয় সংসদীয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান জানালেন, "একজন গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ২৯৭ কনটেইনার (তৈরি পোশাক) রপ্তানি করেছেন কিন্তু এর বিপরীতে একটি ডলারও দেশে আসেনি"। তাহলে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় করা মূল্যবান এই বৈদেশিক মুদ্রা গেল কোথায়? এ প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এমপি সভায় বললেন, "মানি লন্ডারিংয়ের পরিমাণ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় সেকেন্ড হোম করেছেন। দুঃখজনক হচ্ছে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থ পাচারের বিষয়ে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছরে একজনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি"। এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিটিকে অবহিত করার সুপারিশ করলেন তিনি। জাতীয় সংসদের পশ্চিম ব্লকে ১ নম্বর স্থায়ী কমিটির কক্ষে গত ১১ আগস্ট এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ওই বৈঠকের কার্যবিবরণী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ওই কার্যবিবরণীতেই পোশাকশিল্প মালিকদের পণ্য রপ্তানির আয় দেশে না এনে বিদেশে রেখে দেওয়ার মতো এমন চমকে দেওয়া তথ্য উলেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকরা পণ্য রপ্তানি করে সেই অর্থ দেশে ফেরত না এনে তাহলে কোথায় পাঠাচ্ছেন? সেই টাকা দিয়ে কী করছেন তারা? বাংলাদেশ ব্যাংক, কাস্টমস সবার উচিত সমন্বিতভাবে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা।

জানা গেছে, উলিখিত ওই একটিই নয়, এ ধরনের আরও চার হাজারের বেশি গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ 'খতিয়ে দেখা হচ্ছে'। এনবিআর সূত্রগুলো জানায়, রপ্তানি আয় ফেরত না আনা, শুল্ক ফাঁকি দেওয়া, আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং, বন্ডিং সুবিধার অপব্যবহার, অর্থপাচারসহ নানা অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অর্থপাচার-সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনায় এনবিআরের একটি টাস্কফোর্স কাজ করছে। ওই টাস্কফোর্স এরই মধ্যে এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। যেখানে চার হাজার ৫৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৫৬২টি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ উলেখ করে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, উৎপাদনে থাকা চার হাজার ৫৮টি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকেই আমদানি-রপ্তানিতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আর্থিক অনিয়ম করেছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বিদেশে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থপাচার করেছে। এমনকি মালিকদের অনেকের স্ত্রী, সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের নামেও বিদেশে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। ওসব বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরবর্তী সময় দফায় দফায় পণ্য আমদানির নামে অর্থপাচার করেছেন তারা। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশ করে অর্থ পাঠিয়ে পরে নিজেরা ওই অর্থ তুলে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭*

রিজাভের অর্থ চুরির এক বছর

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের হিসাব থেকে চুরি হয় ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া ২ কোটি ডলার ফেরত আসে। বাকি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনে। ফিলিপাইন থেকে এখন পর্যন্ত ফেরত এসেছে মাত্র দেড় কোটি ডলার। বাকি রয়েছে আরও সাড়ে ৬ কোটি ডলার (৫১০ কোটি টাকা)। চুরির এক বছর পর বাকি অর্থ দ্রুত ফেরত পাওয়ার আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ঝিমিয়ে পড়েছে অর্থ উদ্ধারের তৎপরতাও। এ ঘটনায় সরকার তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েও তা প্রকাশ করেনি। অর্থমন্ত্রী প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য একাধিকবার তারিখ দিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছেন। ফলে বিশ্বে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সবচেয়ে বড় সাইবার জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত কারও বিরুদ্ধে এখনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরি হলেও বিষয়টি জানাজানি হয় প্রায় দেড় মাস পর। তথ্য লুকিয়ে রেখেছিল কেন্দ্রিয় ব্যাংক। এ ঘটনায় ১৫ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তৎকালীন গভর্নর আতিউর রহমান। একই দিন সরিয়ে দেওয়া হয় দুই ডেপুটি গভর্নরকে। তৎকালীন ব্যাংকিং সচিবকেও করা হয় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এরপর সাবেক অর্থসচিব ফজলে কবিরকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। ফিলিপাইনে অর্থ বের করে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনকে (আরসিবিসি)। ব্যাংকটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংককে কোনো অর্থ ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনা আরসিবিসির নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের অবহেলা ও অসাবধানতার কারণেই রিজার্ভের ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়েছে। এই ঘটনার দায় আরসিবিসি নেবে না। ফিলিপাইনের পক্ষ থেকে তদন্ত প্রতিবেদনটিও চাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, তদন্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার গাফিলতির কথা বলা হয়েছে। যদিও ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে আরসিবিসি ব্যাংককে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার জরিমানা ও তাদের ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের অ্যান্টি-মানিলন্ডারিং কাউন্সিল মামলা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭*

বড় খেলাপিরা সুবিধা নিয়েও ঋণ পরিশোধ করছে না

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে ২০১৫ সালে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ শোধে বিশেষ নীতিমালা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ সময় ১১ শিল্পগ্রুপের ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়। ব্যাংক সূত্রগুলো বলছে, সুবিধা পাওয়ার এক বছর পর ঋণ পরিশোধের সময় এলে অনেকেই এখন নানা টালবাহানা শুরু করেছে। সুবিধা নেওয়া ব্যবসায়ীদের একটি অংশ এখন আর ঋণ পরিশোধ করছে না। বরং তারা নতুন করে ঋণ চাচ্ছে। আবার আগে সুযোগ না পাওয়া খেলাপিরা নতুন করে ঋণ পুনর্গঠনের দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি একই সুযোগ পেতে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন ৮০ এর মতো ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ী।

বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ২০১৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে গ্রুপের সব ঋণ পুনর্গঠন করার দাবি জানিয়েছিলেন। এরপর অন্য ব্যবসায়ীরাও একই দাবি জানালে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ পুনর্গঠনের নীতিমালা জারি করে। ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রহীতাদের জন্য এ

সুযোগ দেওয়া হয়। নীতিমালা অনুযায়ী, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী খেলাপি হয়ে যাবে। এসব ঋণ আদায়ে দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭-এর আওতায় মামলা করতে পারবে ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০টির মতো প্রতিষ্ঠান ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করলেও ১১ গ্রুপ এ সুবিধা পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ১৫ হাজার ২১৮ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠনের অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপেরই ছিল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সুবিধা পাওয়া অন্য গ্রুপগুলো হলো যমুনা, শিকদার, কেয়া, এননটেক্স, রতনপুর, এস এ, বি আর স্পিনিং, রাইজিং গ্রুপ ও অন্যান্য।

ব্যাংকগুলো জানায়, পুনর্গঠিত ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বর থেকে। কিন্তু চট্টগ্রামভিত্তিক এস এ গ্রুপ ও নারায়ণগঞ্জের বি আর স্পিনিং প্রথম কিস্তি শোধ করেনি। রতনপুর গ্রুপ কিস্তির অর্ধেক অংশ শোধ করেছে। এখন মার্চ মাসের কিস্তি পরিশোধে আগ্রহ দেখাচ্ছে না আরও অনেকে। এর মধ্যে এস এ, রতনপুর, বি আর স্পিনিং কেন্দ্রিয় ব্যাংকের কাছে এক আবেদনে বলেছে, পুনর্গঠিত মেয়াদি ঋণ পরিশোধে ১২ বছরের স্থানে তাদের ২০ বছর সময় দিতে হবে। নতুন করে সুদ আরোপ করা যাবে না। বিদ্যমান ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধে আরও সময় দিতে হবে। নতুন করে চলতি মূলধন দিতে হবে। এই তিন গ্রুপের পুনর্গঠন করা ঋণের পরিমাণ ২ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় সালমান এফ রহমান

বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথমবারের মতো কোনও বাংলাদেশি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান। বেইজিংভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হুরুন গোবাল-এর ওই তালিকার ২২৫৭ জন ধনকুবেরের মধ্যে তিনি রয়েছেন ১৬৮৫ নম্বরে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, সালমান এফ রহমানের সম্পদের পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট- ইমপোর্ট কোম্পানি (বেক্সিমকো)-র যাত্রা শুরু ১৯৭২ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমান বর্তমানে বেক্সিকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

বড় গ্রাহকেরা ঋণ নিয়ে পাচার করছেন

খেলাপি ও অবলোপন করা ঋণ থেকে আদায় কম হওয়া ২০ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে এক সভায় বেসরকারি খাতের একটি ব্যাংকের এমডি জানিয়েছেন, 'বড় কয়েকজন গ্রাহক ঋণ নিয়ে পাচার করেছেন। তাঁরা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম সুবিধায় বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করছেন। আমরা জানার পরও তাঁদের কিছুই করতে পারছি না।' কেন্দ্রিয় ব্যাংকের কাছে এ অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। আরেক এমডি বলেন, 'অনেকে রিট করে নিজেকে খেলাপি দেখানো থেকে বিরত থাকছেন। তাঁরা আবারও ঋণ দেওয়ার জন্য আমাদের ওপর চাপ তৈরি করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাঁদের ঋণ না দেওয়ার জন্য কোনো নীতিমালা করে দিলে আমরা চাপমুক্ত থাকতে পারি।' সভায় লক্ষ্য অনুযায়ী ঋণ আদায় করতে না পারা ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ঋণ আদায় করতে না পারলে ব্যাংকের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। ঋণে অনিয়ম ধরা পড়লে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তা নিতে হবে। ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে এ বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী। সভা সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ আদায়ের হার মাত্র ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। ২০১৬ সাল শেষে দেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা। এর বাইরে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এসব মন্দ ঋণ আর্থিক প্রতিবেদন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এ ঋণ হিসেবে এলে খেলাপি ঋণ হতো ১ লাখ কোটি টাকার বেশি।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ২৯ মার্চ ২০১৭ ও ১৮ এপ্রিল ২০১৭; বাংলাট্রিবিউন, মার্চ ০৯ , ২০১৭

দূষণ ও দখলদারিত্বের কবলে নদ-নদী

হারিয়ে যাচ্ছে তুরাগ

রাজধানীর গাবতলী থেকে মিরপুর বেড়িবাঁধ ধরে আশুলিয়া পর্যন্ত তুরাগ নামের নদটি খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। মিরপুর থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটারের মাঝেমধ্যে তুরাগের বুকে পানির দেখা মিললেও বেশিরভাগ অংশে বালু জমে নদীর পিঠ বেরিয়ে এসেছে। দখল-ভরাট আর দূষণে 'নিখোঁজ' হতে চলেছে তুরাগ। ২০০৫ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলাদেশের নদনদী' থেকে জানা যায়, তুরাগের উৎসমুখ ভাওয়াল গড়ের পাহাড়ি বংশী এলাকা এবং পতিতমুখ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বুড়িগঙ্গা। প্রবাহিত গতিপথের মধ্যে রয়েছে কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর, মির্জাপুর, গাজীপুর, সাভার, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর, দৈর্ঘ্য ৭১ কিলোমিটার। এই ৭১ কিলোমিটারের মধ্যে রাজধানীর উপকণ্ঠের ২২ কিলোমিটার ধারাবাহিক দখল ও দূষণে মরণাপন্ন। সরেজমিন দেখা যায়, মিরপুর এলাকায় বেড়িবাঁধের সিন্নিরটেক থেকে শুরু করে আশুলিয়া পর্যন্ত তুরাগের পাড়ে কয়েকশ' প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দিয়াবাড়ী এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, তুরাগের পাড়ঘেঁষে থরে থরে রাখা আছে বালুরাশি। নদীতে ভেড়ানো কার্গো থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে বালু এনে পাড়ে ফেলা হচ্ছে। সেই বালু এক্স্যাভেটর দিয়ে কেটে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, যেসব স্থানে বালু ফেলা হচ্ছে, সেগুলো ছিল নিচু জলাশয়। কিছু স্থানের জমি নদীর। এভাবে বালু ব্যবসার কারণেও নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে। দখলদাররা কোথাও কোথাও নদীর সীমানা পিলারও উপড়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) তথ্যানুযায়ী, তুরাগে ১৫২টি সীমানা পিলারের মধ্যে ৯০টিই অবৈধ দখলের কারণে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এক জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বাপা ও নদী রক্ষা আন্দোলনের করা যৌথ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তুরাগের দখল হওয়া জমির পরিমাণ এক হাজার ৩৯৮ একর। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, মিরপুর বেড়িবাঁধ এলাকার দু'পাশেই রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) জমি। পাউবোর জমির পর এক সময় তুরাগতীরে কৃষকদের কিছু জমিজমা ছিল, যেসব জমিতে ধানসহ অন্য ফসলের চাষও হতো। ফসলি ওই সব জমি কিনে নিয়ে এবং কেনা অংশের পাশ থেকে পাউবোর জমি ইজারা নিয়ে বা দখল করে শিল্প-কারখানা ও পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। কেউ যদি নদী তীরবর্তী নিচু জমি ভরাট করে স্থাপনা তৈরি করে সেগুলো দেখার দায়িত্ব ঢাকা জেলা প্রশাসন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক)। গাবতলী থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত এলাকার দায়িত্ব পালনকারী রাজউক কর্মকর্তা মোবারক হোসেন জানান, সম্প্রতি ওই এলাকায় গিয়ে বড় ধরনের ৩৫টি অবৈধ অবকাঠামোর তালিকা তিনি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। কর্মকর্তার মতে, যেহেতু ওই জায়গাগুলো বিআইডবিউটিএ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের; সেহেতু অবৈধ দখলদার

উচ্ছেদও তাদের মূল ভূমিকা রাখতে হবে। কিন্তু তারা এসবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষর (বিআইডবিউটিএ) চেয়ারম্যান কমোডর মোজাম্মেল হক বলেন, নদীর সীমানা পর্যন্ত রক্ষার দায়িত্ব বিআইডবিউটিএ কর্তৃপক্ষের। নতুন করে তুরাগের সীমানা যাচাই-বাছাই করতে ঢাকা ও গাজীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কার্যক্রম চলছে। এরই মধ্যে সাড়ে নয় হাজার পিলার তৈরি করা হয়েছে। কর্মকর্তা আরও জানান, তারা নদীর সীমানা চিহ্নিত করে দেন। কিছুদিন পর দেখা যায় সেসব পিলার নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিলারের সীমা অতিক্রম করেও নদী ভরাট করা হয়।

এবার দূষণ ধলেশ্বরী তুরাগ বংশী নদীতে

রাজধানীর হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্পকে বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এ বিবেচনায় কিছু শিল্প ইতোমধ্যে সাভার শিল্পনগরীতে স্থানান্তরও করা হয়েছে। কিন্তু নতুন এ শিল্প নগরে আধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) চালু না হওয়ায় নতুন শিল্প বর্জ্য দূষণ করছে পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরীকে। বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল, সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি দিয়ে দূষণের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। সাভার উপজেলা মিলনায়তনে কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস (সিএলএস) এর সহায়তায় অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (বাস্ট), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ব্রতী সমাজ কল্যাণ সংস্থা, নিজেরা করি ও নদী ও পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ সাভার দূষণের বিষয়ে গণশুনানির আয়োজন করে। গণশুনানিতে বলা হয়, ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য হাজারীবাগ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং উজানে এ রকম একটি পচনশীল চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। সাভার ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যে যেন ধলেশ্বরী এবং সংযুক্ত বংশী, কর্ণতলী খাল দূষিত না হতে পারে এবং সাভারের পরিবেশ যাতে হাজারীবাগের মতো বিপন্ন না হয় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় বলা হয়, সাভার ধামরাই অঞ্চল দিয়ে বংশী, তুরাগ, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা বহমান। এছাড়াও কর্ণপাড়া খাল, ধলাই বিলসহ অসংখ্য বিল, জলাশয় দিয়ে এ অঞ্চল ছিল বেষ্টিত। কিন্তু উপশহর হিসেবে গড়ে উঠার সাথে সাথে অপরিকল্পিতভাবে মিল কারখানা গড়ে উঠায় এসব কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্যে মৎস্য সম্পদ বিলুপ্তির পথে। নদীতে প্রায়ই মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। জেলেরা মাছ ধরে বিক্রি করলে সে মাছ রান্না করার পর কেমিক্যালের গন্ধ পাওয়া যায়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্জ্যের দূষণের কারণে এ দুইটি অঞ্চলের ৭ হাজার একর চাষের জমির উর্বরতা ক্ষমতা, ৬ হাজার একর মৎস্য বিচরণ এলাকা এবং ২ হাজার একর পানি সম্পদ ধ্বংসের পথে। আর এ থেকে সরাসরি ৩৫ হাজার কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আশপাশের জলাশয়, বিল ও নদীর পানিতে শাক-সবজি, তরিতরকারি ধোয়ার কারণে জনস্বাস্থ্যও হুমকির মুখে পড়েছে।

পরিবেশ রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, সাভারের বেশির ভাগ ভূমি উঁচু এবং সমতল বিধায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। বন, গাছপালা ধ্বংস করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বসতি, কল-কারখানা দ্রুত গড়ে উঠায় পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে এ অঞ্চল আজ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সাভারের যে স্থানে ট্যানারি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে তার পাশ দিয়ে তুরাগ, ধলেশ্বরী, বংশী নদী বহমান। তাই এ অঞ্চলে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ব্যতীত চামড়া শিল্প চালু করা হলে তা অভিশাপের মতো হবে। বক্তারা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সিইপিটি পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজের জন্য আলাদা মনিটরিং সেলের ব্যবস্থা, নীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, প্রতিটি কল কারখানায় রাসায়নিক শোধনাগার নির্মাণ ও চালু, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যায় ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) ঘোষণার সাথে বংশী ও ধলেশ্বরী নদীকে মুক্ত করাসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।

ডাইং কারখানার বর্জ্যে ব্রহ্মপুত্রের দূষণ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ উপজেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র শাখা নদের পানি কিছু ডাইং কারখানার বর্জ্যে দূষিত হয়ে গেছে। এতে এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়াসংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদী থেকে শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদটি। এটি রূপগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ছয় কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ হয়ে মেঘনায় মিশেছে। সরু এই নদ দিয়ে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁ বিভক্ত। এটি আড়াইহাজার উপজেলার পশ্চিম পাশের প্রায় অর্ধশত গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। আড়াইহাজার উপজেলার প্রভাকরদী এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, উত্তর দিক থেকে আসা ব্রহ্মপুত্র নদের পানি একেবারে কালো। এ কারণে নদের পানি ব্যবহার করে না এলাকাবাসী। ২০-২২ বছর আগেও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দিয়ে হাজার হাজার একর জমিতে বোরো ধানের চাষসহ গৃহস্থালির সব কাজই করতেন কৃষকেরা। রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁ উপজেলা ও নরসিংদী সদর উপজেলার ডাইং কারখানার বর্জ্যে এই নদের পানি দূষিত হয়েছে। এখন দূষিত পানি সোনারগাঁ উপজেলা দিয়ে মেঘনায় মিশে যাচ্ছে। এলাকাবাসী জানান, একসময় নদীর পানি দিয়ে গোসল করা, রান্নার কাজসহ সব ধরনের কাজ করত মানুষ। আর এখন পানির পচা গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বর্ষা মৌসুমে অন্য জায়গা থেকে কিছু মাছ এই নদীতে এলেও কয়েক দিন থাকার পর মরে ভেসে ওঠে।

ঘোড়াশালে মাত্রা ছাড়িয়েছে পানি বায়ু ও শব্দদূষণ

নরসিংদীর পলাশে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকার চারদিকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে উঠেছে ৩২টি শিল্পকারখানা। এর মধ্যে বায়ুদূষণকারী সিমেন্ট কারখানা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পানিদূষণের জন্য দায়ী সার কারখানাও। এছাড়া রয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র, জুট মিল, পোশাক ও খাদ্যপণ্য প্রস্তুত কারখানাও। প্রতিদিন এসব কারখানার বর্জ্য গিয়ে মিশছে পানিতে, বায়ুতে ছড়াচ্ছে সিমেন্ট কারখানার ছাই। আর বিদ্যুৎকেন্দ্রের শব্দ ছাড়িয়েছে সহনীয় মাত্রা। সব মিলে অপরিকল্পিত এ শিল্পায়নে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ঘোড়াশাল এলাকার প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ। সম্প্রতি ঘোড়াশাল ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র রিপাওয়ারিংয়ের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) সমীক্ষা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। পৌরসভাকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে ১০ কিলোমিটার এলাকার পানি, বায়ু ও শব্দের নমুনার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (সিইজিআইএস)। পলাশ ও ঘোড়াশাল পৌর এলাকায় বিদ্যমান প্রায় সবক'টি শিল্পকারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ব্যবহার

করছে। ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদনরত চারটি ইউনিটেই কনডেনসার কুলিং, অকজুলারি কুলিংসহ অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় পানি ওই নদী থেকে তোলা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য ও এগ্রোকেমিক্যাল বর্জ্যের কারণে নদীর পানিতে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (সিওডি), আয়রন, নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়ার মাত্রাও মান ছাড়িয়েছে। নদীর পানির পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানিতেও আয়রনের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। সিমেন্ট, সার, পেপার ও ডায়িং কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলছে প্রায় সবক'টি শিল্পকারখানা। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও তাদের গরম পানি কুলিং ছাড়াই নদীতে ছেড়ে দিচ্ছে। এতে শীতলক্ষ্যার পানির মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এ ধরনের দূষণ মাছ ও জলজ প্রজাতির জন্য দুর্দশা ডেকে আনছে। বিশেষ করে শীত মৌসুমের দূষণে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশদূষণের পাশাপাশি শিল্পকারখানার বর্জ্য, খরা, ভূ-উপরিভাগের পানির অভাবে ফসলি জমি ও ফসল উৎপাদন কমেছে। ২০১৫ সালের এক তথ্যে দেখা যায়, ওই পৌরসভার ২১ হাজার ৬৪০ হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ২৪৬ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ধান উৎপাদন কমেছে প্রায় ৪ হাজার ৭৩৯ টন।

তথ্যসূত্রঃ সমকাল, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ০৫, ২০১৭; ইত্তেফাক, ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭; বণিক বার্তা, ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০১৭

জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ

কলাপাড়ায় জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে মানববন্ধন-সমাবেশ

ফসলি জমিসহ বসতভিটা অধিগ্রহণ চেষ্টার প্রতিবাদে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ইটবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দারা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। টিয়াখালী ইউনিয়নের গ্রামটিতে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে এতে অংশ নেন কলাপাড়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্তত দুই হাজার মানুষ। সমাবেশে কলাপাড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া যদি একের পর এক জমি অধিগ্রহণ হতে থাকে, তাহলে হাজার হাজার মানুষ তাদের ফসলি জমি, বসতভিটা হারাবে। তা ছাড়া যেসব মানুষ শুধু ফসলি জমির ওপর নির্ভরশীল, তারা সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে। আমরা মনে করি, মানুষজনকে নিঃস্ব করে দিয়ে কোনো উন্নয়ন হতে পারে না"। টিয়াখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দ মশিউর রহমান শিমু বলেন, "পায়রা বন্দর নির্মিত হওয়ার কারণে আমরা চার লেনের সড়ক এবং বন্দরের স্থাপনা নির্মাণের জন্য ৭২ একর জমি দিয়েছি। আরও ৭০০ একর জমি অধিগ্রহণ করবে বলে শুনেছি। এ জন্য মাঠপর্যায়ে কাজও শুরু হয়েছে"।

জমি অধিগ্রহণের খবরে উত্তাল কেরানীগঞ্জ

সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে এমন খবরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভারের কিছু এলাকা। প্রতিবাদ জানাতে গত ৩ এপ্রিল সোমবার কয়েক হাজার মানুষ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন। স্থানীয় একাধিক জনপ্রতিনিধি ও এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মন্ত্রী ও সাংসদদের আবাসনের সুবিধার্থে সম্প্রতি রাজউক 'কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন' প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের অধীন রয়েছে কেরানীগঞ্জের দুই ইউনিয়ন তারানগর ও কলাতিয়া এবং সাভারের ভাকুর্তা। এই তিন ইউনিয়নের ১৬টি মৌজায় দুই হাজার ২৮৭ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ১৬টি মৌজা হচ্ছে আহাদিপুর, বাড়ৈকান্দি, বাড়িলগাঁও, বেউতা, দক্ষিণ বাহেরচর, দেওলী, কাশারিয়া, নাজিরপুর, উত্তর বাহেরচর, তারানগর, ছাগলকান্দি, মুন্সিনোদ্দা, চুনারচর, তুরাগ, পাঁচুলী ও ভাকুর্তা।

চোখে সর্ষে ফুল দেখছে সোনারগাঁর ১০ গ্রামের মানুষ

সোনারগাঁ উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ১০ গ্রামের প্রায় ১২ হাজার মানুষ তিন বছর ধরে চোখে রীতিমতো সর্ষে ফুল দেখছে। তাদের ৭০০ একর ফসলি জমি বালু দিয়ে ভরাট করে ফেলছে ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নামের একটি কোম্পানি। মেঘনা নদীতীরের আরও কয়েক শ একর ফসলি জমি ভরাটের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তারা। পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালে ইউনিক গ্রুপ ওই জমিতে সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি নামে একটি আবাসন প্রকল্প নির্মাণ শুরু করেছিল। স্থানীয় ব্যক্তিদের আপত্তি আমলে নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ওই প্রকল্পে অভিযান চালানো হয়। তখন ৫০ লাখ টাকা জরিমানা ও বালু অপসারণ করে স্থানীয় মানুষের কাছে জমি ফিরিয়ে দিতে বলা হয়। জরিমানা পরিশোধ করলেও জমি ফিরিয়ে দেয়নি ওই কোম্পানি। পিরোজপুর ইউনিয়নের কৃষকেরা জানান, "মাঠ থেকে ফসল তোলার জন্য তাঁরা যখন অপেক্ষা করছেন, ঠিক তখনই রাতের আঁধারে তাঁদের ফসলসহ মাঠ বালু দিয়ে ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। মাটি ভরাটের ঠিকাদারির সঙ্গে স্থানীয় আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা জড়িত থাকায় তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছেন না"। কান্দারগাঁও গ্রামের কৃষকরা বলেন, "মাঠ থেকে সরিষা তোলার বদলে আমরা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। আমাদের জমি ভরাট করে ফেলা হচ্ছে, আবার প্রতিবাদ করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জমি তো গেছেই, বাড়িতেও থাকতে পারছি না"।' জমির মালিকেরা উপজেলা ও জেলা পরিষদের কাছে বারবার চিঠি দিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে অভিযোগ করেছেন। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) থেকে অন্যের কৃষিজমি দখল ও ভরাটের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলাও করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন ও ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূর আলী বলেন, "আমরা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছ থেকে অনুমোদন নিয়েই কাজ শুরু করেছি। তারা অনুমোদন দিলে পরিবেশ ছাড়পত্রের দরকার হয় না। পরিবেশ ছাড়পত্র লাগে শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য"। তবে বেজার চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী বলেন, "ইউনিক গ্রুপের নিজস্ব জমিতে সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন করার প্রাক্-যোগ্যতাপত্র দেওয়া হয়েছে। পরিবেশের সব আইন মেনেই তাদের তা করতে বলা হয়েছে। পরিবেশের সমীক্ষা ও ছাড়পত্র ছাড়া তা করতে বলা হয়নি। কিন্তু এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি, তারা অন্যের জমিতে এসব করছে"। দেশের বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করে এবং অন্যের জমি জোর করে ভরাট করায় ২০১৪ সালে ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্টের তৎপরতার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করে বেলা। সোনারগাঁ উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, জৈনপুর, ছয় হিস্যা, চর ভবনাথপুর, ভাটিবন্ধ ও রতনপুর মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, জলাভূমি ও নিচু জমিতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে ভরাটের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের কাছে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে একটি রিট মামলা করা হয়। উচ্চ আদালত ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিক প্রোপার্টিকে মাটি ভরাট বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসনসহ সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে ইউনিক প্রোপার্টিকে একাধিকবার বালু

উত্তোলন ও জমি ভরাট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরেও প্রতিষ্ঠানটি মাটি ভরাটের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; ০৪ এপ্রিল ২০১৭

উচ্ছেদ আতঙ্কে নাইক্ষ্যংছড়ির চার গ্রামের শতাধিক পরিবার

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৬৮ নং রেজু মৌজার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের অন্তত চার গ্রামের শতাধিক পাহাড়ি-বাঙ্গালী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে ভূগছে। স্বাধীনতার পর ওই এলাকায় বসবাসযোগ্য করে কোন মতে মাথাগোজার স্থান তৈরি করে এসব পরিবার। গত ১২ মার্চ ৪০/৫০ জনের সংঘবদ্ধ একটি দল হঠাৎ এসব গ্রামে এসে তাণ্ডব চালায়। মন্ত্রীপরিষদের সচিবের নাম ভাঙ্গিয়ে বহিরাগতরা ওই এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে এসে বাড়ি ঘরে ভাংচুর ও বাগান কর্তনের পর মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রাণি শুরু করেছে। এরা স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল আলীমের বসতবাড়ি ভাঙচুর এবং সৃজিত বাগান কেটে ধ্বংস করে দেয়। এ সময় অন্য বাসিন্দাদেরও এলাকা ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয় এরা। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ১৮ মার্চ এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন। সরেজমিন দেখা যায়, স্বাধীনতার পর এলাকায় বনায়ন, ফলদ বৃক্ষবাগান এবং বসতবাড়ি নির্মাণ করে কিছু মানুষ বিস্তীর্ণ বিরানভূমিকে বসবাসযোগ্য করেন। ধীরে ধীরে ওই এলাকায় চারটি গ্রাম গড়ে ওঠে। বর্তমানে এটি সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডভুক্ত। এতদিন কেউ উৎপাত না করলেও সম্প্রতি একটি চক্র এই এলাকাকে নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেছে। এরা দাবি করছেন, এসব ভূমি তাদের নামে লিজ দেওয়া হয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মংনু মারমা বলেন, 'সোনাইছড়ির রেজু মৌজায় ১৯৮০-৮১ সালে রাবারবাগান সৃজনের জন্য ২০ বছরের লিজ দেওয়া হয় বলে শুনেছি। লিজের ভূমিতে ১০ বছরের মধ্যে বাগান সৃজনের কথা রয়েছে। কিন্তু গত ৩৫ বছরেও লিজ পাওয়া ভূমিতে কোনো ধরনের রাবারবাগান তৈরি করা হয়নি। ইতিমধ্যে পাহাড়ি ও বাঙালি শতাধিক পরিবার বহু বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন।' তিনি জানান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন কাজ করছে। এ অবস্থায় সার্ভেয়ার, হেডম্যানের রিপোর্ট ছাড়া ২০১৫ সালে কীভাবে লিজ অনুমোদন হয় তা তাঁদের বোধগম্য নয়।

তথ্যসূত্রঃ নিউজ অফ খাগড়াছড়ি, ১৮ মার্চ ২০১৭; কালের কণ্ঠ, ২১ মার্চ, ২০১৭

খুদভুট্টা থেকে জ্বালানি উৎপাদনের অনুমতি

খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় না রেখে সরকার খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে কাঁচা মাল হিসেবে চালের খুদ, ভুট্টা ও চিটা গুড় ব্যবহার করা হবে। গত ১৫ জানুয়ারি সরকার এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, উৎপাদিত জৈব জ্বালানি প্রতি লিটার পেট্রল ও অকটেনে ৫ শতাংশ হারে মেশানো হবে। এই জ্বালানি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্ট স্থাপন এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরিরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আর খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি জ্বালানি মন্ত্রণালয়। এতে করে দরিদ্র মানুষের খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়টি যথাযথভাবে আমলে নেওয়া হয়নি বলে মনে করছেন খাদ্যনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। জ্বালানি কোম্পানি সুনিপুণ অর্গানিক লিমিটেডের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ছয় সদস্যের একটি কমিটিকে এর সম্ভাব্যতা এবং উপযোগিতা বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলে। ওই কমিটিতে খাদ্য ও কৃষিসংক্রান্ত সরকারি কোনো বিভাগের প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি। ওই কমিটির হিসাবে, প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ৭৫ হাজার লিটার জৈব ইথানল তৈরি করা হবে। এতে ৬০ হাজার টন খুদ, ৬২ হাজার টন ভুট্টা ও প্রায় ১ লাখ টন চিটা গুড় লাগবে।

বাংলাদেশ পোলট্রিশিল্প সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক মশিউর রহমান বলেন, "হঠাৎ করে জৈব জ্বালানি উৎপাদনের অনুমতি দিলে মুরগি ও মাছের খাদ্যের কাঁচামাল খুদ ও ভুট্টা জ্বালানিতে চলে যাবে। ফলে দাম যাবে বেড়ে"। খাদ্য থেকে ইথানল তৈরি করলে খাদ্যনিরাপত্তায় কোনো সমস্যা হবে না দাবি করে সুনিপুণ অর্গানিক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খান মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, "ভুট্টা প্রক্রিয়াজাত করে যেসব উপজাত তৈরি হবে, তা আবার পোলট্রি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আর বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ, এখানে এখন আর কেউ চালের খুদ ও চিটা গুড় খায় না"। এ ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও কৃষি বিশেষজ্ঞ জেড করিম মুরগি ও মাছকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে উলেখ করে বলেন, "এই খাতের খাদ্য হিসেবে খুদ ও ভুট্টা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই। এসব খাদ্য জ্বালানি কোম্পানিগুলো উচ্চ দামে কেনা শুরু করলে দাম বেড়ে যাবে। এতে গরিব মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সরকারের উচিত হবে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা"।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৭

সেলফোন অপারেটর: ব্যবসা-মুনাফা বাড়ছে কর্মসংস্থান যৎকিঞ্চিৎ

নিজস্ব জনবলের পরিবর্তে বিভিন্ন কাজের আউটসোর্স করা কর্মীর ওপরই বেশি নির্ভর করছে সেলফোন অপারেটররা। দেশের সেলফোনসেবা খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত সাড়ে সাত লাখের বেশি মানুষ। আর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান আড়াই লাখের মতো। এর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ নিয়োগ দেয় সেলফোন অপারেটররা। টেলিকম খাতের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের মধ্যে আবার আনুষ্ঠানিক কর্মীর সংখ্যা ৫০ হাজার। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ বা সাড়ে ১২ হাজার সেলফেন অপারেটরদের সরাসরি নিয়োগ দেয়া। দেশের সেলফোনসেবা খাতের কর্মসংস্থানের এ তথ্য সেলফোন অপারেটরদের বৈশ্বিক সংগঠন গোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের (জিএসএমএ)। খাতসংশিষ্টরা বলছেন, একসময় সেলফোন অপারেটররা ব্যাপক ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দিলেও এখন সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে। বরং বিদ্যমান নিজস্ব জনবলই ছোট করে আনছে। এর বিপরীতে তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সেবা নিচ্ছে অপারেটররা। প্রয়োজনে নিজস্ব জনবল নিয়োগ দিলেও তা চুক্তিভিত্তিক। অনেকে আবার নিয়োগপত্র ছাড়াও সেলফোন অপারেটরদের হয়ে কাজ করছেন। যদিও সেলফোন অপারেটরদের ব্যবসা ও মুনাফা বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য বলছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর দেশের ছয় সেলফোন অপারেটর (রবি-এয়ারটেল একীভূতকরণের আগে) ব্যবসা করেছে ২২ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকার।

২০১৪-১৫ অর্থবছর এর পরিমাণ ছিল ২২ হাজার কোটি ও ২০১৩-১৪ অর্থবছর ২০ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা।

সেলফোন অপারেটরদের নিজস্ব কর্মীরা কাজ করেন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা, কল সেন্টার, গ্রাহকসেবা কেন্দ্র এবং পণ্য ও সেবা বিপণনে। সবচেয়ে বেশি নিজস্ব কর্মী রয়েছে গ্রামীণফোনের, পাঁচ হাজারের বেশি। এছাড়া বাংলালিংকের প্রায় দুই হাজার এবং রবি ও এয়ারটেলের আড়াই হাজার। সাড়ে ১২ হাজারের মধ্যে বাকি কর্মী টেলিটক ও সিটিসেলের। তবে কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ায় সিটিসেলের জনবল কমে আসছে। নিজস্ব জনবলের পরিবর্তে বিভিন্ন কাজের আউটসোর্স করা কর্মীর ওপরই বেশি নির্ভর করছে সেলফোন অপারেটররা। মূলত বিভিন্ন কারিগরি সেবা, নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, কল সেন্টার, যানবাহন, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, ডে-কেয়ার সেন্টার, আইটি হেল্পডেস্ক, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্যাকেজিংসহ অপারেটরদের বেশকিছু কাজের দায়িত্ব পালন করছে আউটসোর্স কোম্পানিগুলো। আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সংকোচনের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের যেসব দায়বদ্ধতা বর্তায়, তা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিচ্ছে অপারেটররা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশিষ্ট সেলফোন অপারেটরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষেরও সম্পৃক্ততা রয়েছে।

আউটসোর্স করা জনবলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে রয়েছে শীর্ষ সেলফোন অপারেটর গ্রামীণফোন। তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ কর্মী গ্রামীণফোনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবা দিচ্ছেন। এছাড়া বাংলালিংকের দুই হাজার, রবি ও এয়ারটেলের প্রায় দুই হাজার কর্মী সংগ্রহ করা হয়েছে আউটসোর্স প্রতিষ্ঠান থেকে। নিজস্ব কর্মীর পরিবর্তে আউটসোর্সিংয়ের ওপর জোর দেয়া গ্রামীণফোনের ব্যবসা বাড়ছে। গ্রামীণফোন প্রকাশিত আর্থিক ফলাফল অনুযায়ী, ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি আয় করে ১১ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির কর-পরবর্তী মুনাফা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা, যা গত বছর ছিল ১ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। এছাড়া রবি ও এয়ারটেল একীভূত হওয়া, বাংলালিংকের জনবল সংকোচন এবং সিটিসেলসেবা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেলফোনসেবা খাতে আগামীতে জনবল আরো কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশিষ্টরা। অপারেটরগুলো কয়েক বছর ধরে একাধিকবার স্বেচ্ছা অবসর কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের জনবল কমিয়ে এনেছে। বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে আগামীতে এ খাতের জনবল এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসবে বলে মনে করছেন তারা। রবি ও এয়ারটেল একীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ অপারেটর ছিল বাংলালিংক। ইউএনআই বাংলাদেশ অ্যাফিলিয়েটস কাউন্সিলের (ইউএনআইবিএসি) উপসভাপতি ও গ্রামীণফোন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (জিপিইইউ) সাধারণ সম্পাদক মিয়া মো. শফিকুর রহমান মাসুদ বলেন, "আয় বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছেন কর্মীরা। অন্যদিকে ব্যয় কমাতে প্রতিষ্ঠানগুলো জনবল কমিয়ে আনছে। সরাসরি নিয়োগ কমিয়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তারা। এছাড়া এখন শিক্ষানবিশ বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দিচ্ছে অপারেটররা। এতে অনিশ্চিত হয়ে উঠছে এ খাতের কর্মসংস্থান। আর খাতটির কর্মীরা চাকরিচ্যুত হলে বিকল্প কোনো খাতে কাজের সুযোগও গড়ে ওঠেনি। সামগ্রিকভাবে এটি আগামীতে আর্থসামজিক সংকট তৈরি করতে পারে। এজন্য বিষয়টিতে সরকারের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন"।

তথ্যসূত্রঃ ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০১৭, বণিক বার্তা

এনজিও'র কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে কৃষকের আত্মহত্যা!

এনজিও'র ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে যশোরের শার্শা উপজেলার পোড়াবাড়ি গ্রামে শাজাহান (৪০) নামে এক কৃষক কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, ঋণের টাকা আদায়ে এনজিও কর্মীরা নিয়মিত শাজাহানের বাড়িতে এসে বকাঝকা এমনকি গালিগালাজও করতেন। অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেন। নিহতের ভাই আলাউদ্দিন জানান, শাজাহান পেশায় কৃষক। তিনি জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিও থেকে ৩০ হাজার টাকা, আশা থেকে ৪৫ হাজার, ব্র্যাক থেকে ৩০ হাজার, ঠেঙ্গামারা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) থেকে ৫০ হাজার টাকা ছাড়াও আরও দুই-তিনটি এনজিও থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এসব ঋণ ও সুদের টাকা আদায়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই এনজিও কর্মীরা তার বাড়িতে আসতেন। কিন্তু শাজাহান প্রায়ই কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হতেন। তখন এনজিও কর্মীরা তাকে বকাঝকা, অপমান করতেন। শাজাহানের স্ত্রী মুসলিমা বেগম সাংবাদিকদের জানান, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ব্র্যাকের কর্মীরা কিস্তি আদায় করতে তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু শাজাহান টাকা দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় ব্র্যাকের কর্মীরা খুবই দুর্ব্যবহার করেন। তারা হুমকি দিয়ে যান, বুধবার এসে কিস্তির টাকা আদায় করেই ছাড়বেন।

ব্র্যাকের ঝিকরগাছা এরিয়া ম্যানেজার শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম হোসেন জানান, "শাজাহান তার স্ত্রীর নামে গত মাসে ঋণ নেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা কিস্তিও পরিশোধ করেননি। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি তার কিস্তির টাকা পরিশোধের নির্ধারিত দিন ছিল"।

তথ্যসূত্রঃ *বাংলা ট্রিবিউন, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১৭*

আবারো পুড়ল কড়াইল বস্তি

গত ১৫ মার্চ বুধবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগে। পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় পর রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে লাগা ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বস্তিবাসীরা বলছেন, আগুনে অনেক ঘর পুড়ে গেছে। বেশির ভাগ বাড়ি টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি। রাস্তা সরু থাকায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো ঢুকতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। কড়াইল বস্তিতে অনেক মানুষ বাস করে। তাদের বেশির ভাগই স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী। প্রায় প্রতিবছরই এখানে অগ্নিকাণ্ড হয়। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে এ বছরের ১৬ মার্চ পর্যন্ত এ নিয়ে তিনবার এই বস্তিতে আগুন লাগল। ২০১৬ সালের ১৪ মার্চ এখানে আগুন লাগে। এরপর ৪ ডিসেম্বর আগুন লাগে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০১৭*

শ্রমিক আন্দোলনের খবর

রংপুরে রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের কর্মবিরতি

শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, উৎসব ভাতা, কল্যাণ তহবিলসহ সাত দফা দাবিতে রংপুরে গত ১৫ মার্চ রেস্তোরাঁ শ্রমিকেরা সকাল থেকে আধা বেলা কর্মবিরতি পালন করেছেন। পুলিশ সাতজন শ্রমিককে আটক করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রংপুর জেলা রেস্তোরাঁ শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচি চলাকালে অধিকাংশ রেস্তোরাঁ বন্ধ ছিল। আটকের বিষয়টি জানাজানি হলে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা জোটবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ

মিছিল বের করে কোতোয়ালি থানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বকেয়া বেতন দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের অবরোধ, সংঘর্ষ

গত ২৩ মার্চ সকাল ৮টার দিকে 'লিরিক' ইন্ডাস্ট্রিজের শতাধিক শ্রমিক মোলা প্লাজার সামনে বকেয়া বেতন দাবিতে বাড্ডা-রামপুরা-মালিবাগ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বাধা দিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেটের আঘাতে পাঁচ শ্রমিক আহত হয়, এ সময় ইটের আঘাতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের মারফত জানা যায়, গত ২০ মার্চ সোমবার রাতে হঠাৎ করেই লিরিক ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ করে অনেক যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলেছে। মঙ্গলবার সকালে এসে তারা দেখেন কারখানা বন্ধ। কী কারণে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা তারা জানেন না। তাদের কোনো টাকা-পয়সাও দেওয়া হয়নি। তারা গত তিন দিন ধরে আন্দোলন করলেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০১৭; ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ, ২০১৭

ট্যানারি শ্রমিকদের চোখেমুখে অন্ধকার

রাজধানীর হাজারীবাগের বিভিন্ন ট্যানারিতে কর্মরত শ্রমিকদের পথে বসার মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কারখানার মালিকদের দেখা পাচ্ছেন না তারা। সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে কারখানা সরিয়ে নিতে বাধ্য করতে রাজধানীর হাজারীবাগের ছোট-বড় প্রায় ২৫৪টি ট্যানারি ও অন্যান্য চামড়া সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি এবং টেলিফোন সংযোগ গত ৮ এপ্রিল বিচ্ছিন্ন করেছে পরিবেশ অধিদফতর। ৯ এপ্রিল সকালে কারখানায় এসে হাজিরা দিয়ে চলে গেছেন অনেক শ্রমিক। কারণ হাজারীবাগের কারখানাগুলো এখন বন্ধ। সাভারেও তৈরি হয়নি নতুন কারখানা। এমন অবস্থায় অনেকেই নতুন কাজের সন্ধানে ছুটছেন সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে। হাজারীবাগ থেকে সাভারের দূরত্ব কম নয়। সেখানে কোথায় থাকবেন, কোথায় উঠবেন কিংবা কাজ করবেন কোথায়, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই কারও কাছে। সবকিছুই এখন তাদের কাছে ঘোলাটে। কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে কোথায় কাজ করবেন আর কীভাবে সংসার চলবে সে দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে তাদের। এদিকে শ্রমিকরা এ পর্যন্ত যেসব কারখানায় কাজ করেছেন, সেখানকার বেতনাদিও পরিশোধ হয়নি। এখনও মার্চ মাসের বেতন পাননি কেউই। পাওনা বকেয়া বেতন পাওয়া যাবে কিনা তা জানেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ বলেন, "চাইলেই যেমন আমরা রাতারাতি সাভারে কারখানা চালু করতে পারবো না। একইভাবে চাইলেই হাজারীবাগের কারখানা থেকে মেশিনপত্র খুলে নিতে পারবো না। কারণ এসব মেশিনপত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছি। এখন এই মেশিনপত্র খুলতে গেলে ব্যাংক বাধা দেবে। সাভারে আমরা যারা প্লট পেয়েছি, তাদের প্লটের জমির দলিল দেওয়া হয়নি। জমির দলিল না পেলে হাজারীবাগ থেকে মেশিনপত্র খুলে সাভারের কারখানায় নিতে পারবো না। সাভারে কারখানা চালু করতে না পারলে শ্রমিকদের কোন কাজে নেবো?" এ প্রসঙ্গে বিসিক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার বলেন, "ট্যানারি মালিকরাই সাভারে তাদের কারখানা স্থানান্তরের বিষয়ে গড়িমসি করেছেন। কারণে- অকারণে তারা বারবার কালক্ষেপণ করেছেন। এ নিয়ে বিসিকের ওপর দায় চাপানো ঠিক হবে না। সাভার এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। এছাড়া শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের বিষয়ে বিসিকের তো কিছু করার নাই। কারখানার শ্রমিকদের বেতন মালিকরা দেবেন, এটাই তো নিয়ম"। ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক বলেন, "হাজারীবাগের ট্যানারিতে ৩০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করে। এই শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করছে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা। আদালতের রায়ে সব সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার পর মালিকরা ট্যানারি সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। একসঙ্গে এত কারখানা সাভারে সরিয়ে নেওয়া যেমন সম্ভব নয়, একইভাবে এই মুহূর্তে এত শ্রমিককেও কাজে নেওয়া যাবে না। ফলে বেকার হয়ে পড়বেন হাজার হাজার শ্রমিক। হাজারীবাগের বিষয়টি এখন মানবিক বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটি কাটিয়ে উঠতে সরকারের দিকনির্দেশনা প্রয়োজন"।

তথ্যসূত্রঃ *বাংলা ট্রিবিউন, ১২ এপ্রিল, ২০১৭*

রুমায় পাহাড়ি ঝিরি থেকে অবাধে তোলা হচ্ছে পাথর

বান্দরবানের রুমা উপজেলার বিভিন্ন ঝিরি (পাহাড়ি ছড়া), ঝরনার পাড় ও প্রাকৃতিক পানির উৎস থেকে অবাধে পাথর তোলা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর দুই জেলা খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। বিশেষ করে অপরূপ সৌন্দর্যের রুমা খাল, মরিয়মপাড়া, চম্পাঝিরি, রুংরাং ঝিরি, গোদারঝিরি, ব্যাঙ ঝিরি, মিয়ংঝিরি, রোয়াংছড়ি উপজেলার অংতং খুমিপাড়া, ঘেরাউ, হেডম্যানঝিরি, প্রাংসা ঝিরি, কানাইজো ঝিরি, সদর উপজেলার টংকবর্তী, গেজমনিপাড়া, রেইছা, থানচি উপজেলার নাইক্ষংঝিরি, শিলা ঝিরি, তিন্দুমুখসহ বিভিন্ন এলাকায় চলেছে অবৈধ পাথর উত্তোলনের মচ্ছব। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক এক বৈঠক শেষে জেলা প্রশাসন অবিলম্বে পাথর উত্তোলন বন্ধের নির্দেশনা দিলেও অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়নি। প্রথম আলোর ৩ মার্চ প্রকাশিত সরেজমিন প্রতিবেদনে এ চিত্র দেখা যায়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রুমা উপজেলার রুমা খালের মুখ এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, শ্রমিকেরা পাথর ভাঙার কাজ করছেন। প্রথম আলোর ১৭ মার্চে প্রকাশিত আরেকটি সরেজমিন প্রতিবেদনেও দেখা যায়, অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়নি। রুমা খাল ও বগা খাল ঝিরিতে পাথর তোলায় নিয়োজিত শ্রমিকেরা জানান, দৈনিক ৪০০ টাকা মজুরির বিনিময়ে পাথর তুলছেন তাঁরা। মাস খানেকের বেশি সময় ধরে রুমার বিভিন্ন দুর্গম ঝিরি-ঝরনা থেকে পাথর তোলা হচ্ছে বলে জানান শ্রমিকেরা। প্রতিটি ঝরনা থেকে প্রতিদিন ২০০ মণ পাথর তোলা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাসিন্দারা জানান, রুমা উপজেলার একাধিক সড়কে সেতু ও কালভার্ট তৈরির কাজ চলছে। এসব সেতু ও কালভার্টে ব্যবহারের জন্যই পাহাড় ও ঝিরি থেকে পাথর তোলা হচ্ছে। কাছাকাছি অবস্থিত পাইন্দু ও সামাখাল ঝিরি থেকেও এভাবে পাথর তোলা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। নির্বিচারে পাথর তোলার কারণে ঝিরি-ঝরনাগুলোর পানির ধারণক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেন, প্রাকৃতিক পরিশোধন ব্যবস্থার কাজ করা পাথর তুলে নিলে ঝিরির পানি দূষিত হয়ে পড়বে। ঝিরিসংলগ্ন পাড়াগুলোতে পানির অভাব দেখা দেবে। এতে পাড়ার পরিবেশ ও মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। এ ব্যাপারে বান্দরবান মৃত্তিকা ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাহাবুবুল

আলম বলেন, "পাথর ঝিরি-ঝরনার পানি ধরে রাখে। পাথর উত্তোলন করলে ঝিরি-ঝরনা শুকিয়ে যাবে। তা ছাড়া রুমার রুমা খাল ও বগা খাল থেকে পাথর তোলার কারণে বগা লেকের প্রাকৃতিক পরিবেশও হুমকির মুখে পড়তে পারে"।

রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী মোহাম্মদ চাহেল তন্তুরি বলেন, "রুমায় পাথর উত্তোলনের কোনো অনুমতিপত্র দেওয়া হয়নি। কিন্তু দুর্গম এলাকায় গিয়ে এসব তদারকি করা অত্যন্ত কঠিন"। রুমা উপজেলা সদর থেকে বগালেক পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ১৯ প্রকৌশল নির্মাণ ব্যাটালিয়নের (ইসিবি) উপ-অধিনায়ক মেজর ফয়সল চৌধুরী বলেন, "ঝিরি থেকে পাথর তোলার জন্য কোনো ঠিকাদারকে বলা হয়নি। সড়ক নির্মাণের নামে কেউ ঝিরি থেকে পাথর তুললে তা দুঃখজনক। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে"। তবে ইস্টিশন বগে অজল দেওয়ানের প্রকাশিত একটি ব্লগপোস্টে মংমিনুং নাহিদ এর তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, একটি ট্রাক যার গায়ে সাটা আছেঃ "বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, রুমা বগালেক কেউক্রাডং রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পে জরুরি কাজে নিয়োজিত, বাস্তবায়নে ১৯ ই.সি.বি."- সেই একই ট্রাক রাস্তা নির্মাণের জন্য ঝিরিগুলো থেকে পাথর সংগ্রহ করছে।

তথ্যসূত্রঃ *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; প্রথম আলো, ০৩ মার্চ ২০১৭ ও ১৭ মার্চ ২০১৬; 'বান্দরবানের রুমা খালঃ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিত ও কিছু পর্যালোচনা'- অজল দেওয়ান, ইস্টিশন ব্লগ, ৭ মার্চ ২০১৭*

বাস-মিনিবাসে নৈরাজ্য, মানুষের চরম দুর্ভোগ

রাজধানীতে সিটিং সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত এবং বিআরটিএর অভিযানে নগরে বাসুমিনিবাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক পরিবহনমালিক গত ১৬ এপ্রিল রোববার থেকে বাস-মিনিবাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন। সড়কে বাস-মিনিবাস অনেক কম থাকায় যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন নগরবাসী। অন্যদিকে 'সিটিং সার্ভিস' বন্ধ হলেও ভাড়া কমেনি। ৪ এপ্রিল ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি সংবাদ সম্মেলন করে সিটিং সার্ভিস প্রথা বাতিল করার ঘোষণা দেয়। সড়ক পরিবহন সমিতি ৪ এপ্রিল আরও যেসব সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ১৫ এপ্রিলের পর যাত্রীদের কাছ থেকে কোনোভাবেই অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া যাবে না। ভাড়ার তালিকা বাসের ভেতর দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে। ছাদের ওপরে ক্যারিয়ার, সাইড অ্যাঙ্গেল ও ভেতরের অতিরিক্ত আসন খুলে ফেলতে হবে। প্রতিটি বাস ও মিনিবাসে নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণ করতে হবে। এক মাসের মধ্যে রংচটা, রংবিহীন, জরাজীর্ণ বাস মেরামত করে রাস্তায় নামাতে হবে। তবে অনেকেই এখনো সেগুলো মানছেন না। মোটরযান আইন অনুসারে, সিটিং সার্ভিস বলে কিছু নেই। চালকের আসনসহ মিনিবাসে ৩১টি আসন থাকবে। কিন্তু রাজধানীতে প্রায় সারা দিনই দাঁড়িয়ে যাত্রী যাতায়াত করে। যাত্রীরা সকাল ও বিকেলে অফিসযাত্রা ও ছুটির সময় দরজাতেও ঝুলে যাতায়াত করেন। ঢাকা পরিবহন মালিক সমিতি ১৫ এপ্রিল থেকে নগরে বাস ও মিনিবাসে 'সিটিং সার্ভিস' বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ এপ্রিল থেকে রাজধানীতে শুরু হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয় গণপরিবহনে নৈরাজ্য।

মোটরযান আইন মানছে না কেউ: যখন-তখন বাস বন্ধ

ফার্মগেট, আরামবাগ, ফকিরাপুল, মতিঝিল, টিকাটুলী, গুলিস্তান, আজিমপুর, নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, গণপরিবহনের ভাড়া ও নিয়মের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাসের ভেতরে গন্তব্য অনুসারে ভাড়ার তালিকা টাঙানোর নিয়ম থাকলেও তা দেখা যায়নি। একই পথের কোনো পরিবহন সিটিং সার্ভিস বাতিল করলেও অন্য পরিবহন তা বহাল রেখেছে। মোটরযান আইন ও রুট পারমিটের (চলাচলের অনুমতি) শর্ত লঙ্ঘন করে ঢাকায় প্রায় ৪০ শতাংশ বাস ও মিনিবাস চলাচল করেনি। এতে দিনভর দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সাধারণ যাত্রীদের। এভাবে ইচ্ছাকৃত বাস বন্ধ রাখার দায়ে রুট পারমিট বাতিলের বিধান রয়েছে। বাড়তি মুনাফার জন্য বাস-মিনিবাসে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বাড়তি আসন সংযোজন করে অতিরিক্ত যাত্রী গাদাগাদি করেও বহন করা হচ্ছে, যা মোটরযান আইনের পরিপন্থী ও রুট পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন। এতে পদে পদে মূলত যাত্রীরা ভোগান্তির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও ঠকছে। প্রায় প্রতিটি বাসস্ট্যান্ডেই যাত্রীদের বাসের জন্য খররোদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ভাড়া নৈরাজ্য নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে লোকাল সার্ভিসে আয় কমে যাওয়ার কথা বলেছেন পরিবহনসংশিষ্ট ব্যক্তিরা। ফাল্গুন পরিবহনের সুপারভাইজার মো. রাজ জানালেন, "আগে সিটিং সার্ভিসে ভাড়া ছিল ৫০ টাকা, এখন লোকাল সার্ভিস চলছে, ভাড়া ৩৫ টাকা। বাসগুলো চালকেরা মালিকের কাছ থেকে দিন চুক্তিতে নিয়ে চালান। প্রতিবার যাওয়ার জন্য ৭০০ টাকা জমা দিতে হয়। জ্বালানি তেল লাগে প্রায় ৫০০ টাকার। বাসে আসন ৪০টি। সিটিং সার্ভিসে ভাড়া আসত ২ হাজার টাকা। এখন ভাড়া উঠছে ১ হাজার ৪০০ টাকা। কাজেই চালকদের পোষাচ্ছে না। তাঁরা বাস নিচ্ছেন না। ফাল্গুন পরিবহনের ৩৫টি বাস, এর মধ্যে গতকাল সাতটি বাস পথে নেমেছে"। গত ১৬ এপ্রিল থেকে মোটরযান আইন মেনে সিটিং সার্ভিস বন্ধ করতে রাস্তায় নামেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরিবহন খাতের প্রভাবশালীদের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, "কেউ নানা অজুহাতে যদি গাড়ি না চালায় আমরা কি আমাদের দেশের বাস্তবতায় কি জোর করে গাড়ি নামাতে পারব? আর গাড়ির সাথে যারা জড়িত, তারা খুব সামান্য মানুষ না, তারা অনেকেই খুব প্রভাবশালী"।

সিটিং লোকাল হলো, ভাড়া কমল নাঃ যাত্রীরা শুধু ঠকছে

গণপরিবহনের অনুমতির শর্তে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় বা মৌসুম এবং নির্দিষ্ট যানবাহন বাদে সব বাস-মিনিবাসে নির্ধারিত আসনের অধিক যাত্রী বহন করা যাবে না। তবে নিবন্ধনের শর্তের মধ্যে বলা আছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাইলে ১০ জন যাত্রী দাঁড় করিয়ে নিতে পারবেন। তবে বাসের মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা কমপক্ষে ছয় ফুট হতে হবে। আর মাঝখানের পথটি ১৮ ইঞ্চি চওড়া হতে হবে। বিআরটিএর সূত্র বলছে, ঢাকার কোনো মিনিবাসই এত উঁচু নয়। এই নিয়ম বাসের ভেতরের স্থান দেখে ঠিক করে দেওয়ার কথা সরকারের। তবে তা করা হয় না। যাঁরা বাস-মিনিবাসে আসন পান, তাঁরাও পা সোজা করে বসতে পারেন না। বিআরটিএর আইন অনুসারে, যাত্রীবাহী বাস-মিনিবাসের আসনের হেলান দেওয়ার স্থান অন্য আসনের হেলান দেওয়ার স্থানের দূরত্ব হতে হবে ২৬ ইঞ্চি। বিআরটিএ সূত্র বলছে, ঢাকার বেশির ভাগ বাসেই এই পরিমাণ ফাঁকা জায়গা নেই। রাজধানীর আগারগাঁও, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার মোড়, শাহবাগ ও রমনা এলাকায় বাসে থাকা এবং অপেক্ষমাণ যাত্রীদের অভিযোগ, গত ১৫ এপ্রিল থেকে সিটিং সার্ভিস বন্ধ হওয়ার পর সব বাসেই ঠাসাঠাসি করে যাত্রী তোলা হচ্ছে। লোকাল বাসের মতো যত্রতত্র যাত্রী উঠিয়ে আসনের প্রায় দ্বিগুণ যাত্রী বহন করা

হচ্ছে, যাত্রী টইটুম্বর না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি ছাড়া হচ্ছে না। আবার বেশি যাত্রী যেন দাঁড়াতে পারে সেজন্য বেশ কিছু সিট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ ভাড়া নেয়া হচ্ছে আগের সেই সিটিং সার্ভিসের মতোই। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বচসা-মারামারির ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন স্থানে। অনেক নারী যাত্রী অভিযোগ করেন, "অন্য দিনের চেয়ে আজ বাসে যাতায়াত সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, সিটিং না থাকায় সমানে যাত্রী তুলছে বাসগুলো। যাত্রী পূরণ হয়ে গেলে বাসগুলো যেন আর যাত্রী না তোলে সেটিও দেখা দরকার। কিন্তু সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। এ কারণে নারীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ল"।

বাসেরও সংকট

ঢাকা ও এর আশপাশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। পরিবহনমালিকেরা বলছেন, যান্ত্রিক ত্রুটিসহ নানা কারণে এর প্রায় এক হাজার চলে না। যানজটের কারণে প্রায় সব বাসই দিনে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঁচবারের বেশি আসা-যাওয়া করে না। ফলে যত যাত্রী যাতায়াত করার সুযোগ রয়েছে, তা-ও অব্যবহৃত থাকে। এতে স্বাভাবিক ব্যস্ত সময়েও যাত্রীরা বাস পান না। যানজট ও স্বাভাবিক সময়ে বাস চলাচলের একটি চিত্র পাওয়া যায় গত বছর প্রকাশিত ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত সময়ে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে গুলশান ও গুলিস্তান হয়ে পোস্তগোলা পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে যানবাহনের গড় গতি ঘণ্টায় ২২ কিলোমিটার। আর ব্যস্ত সময়ে ঘণ্টায় ৯ কিলোমিটার। এই গবেষণায় আরও এসেছে যে ঢাকায় প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য ৩০টি বাস রয়েছে। অথচ দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হংকং ও লন্ডনের মতো মেট্রোরেল থাকা শহরে এর চেয়ে অনেক বেশি বাস চলে।

আবারও 'সিটিং সার্ভিস' চালু করতে মালিকদের চাপ

পরিবহন মালিকদের নৈরাজ্য বন্ধে বিআরটিএ প্রতিদিন পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বিভিন্ন কোম্পানিকে জরিমানা, বাস আটক ও চালকদের কারাদণ্ড দিলেও গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফিরছে না। বরং ভ্রাম্যমাণ আদালতকে ফাঁকি দিতে বহু মালিক তাদের বাসের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। এসব বাস বিভিন্ন সড়কের ধারে কিংবা খালি মাঠে স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পরিবহন নেতারা এবার বিজয় আশা করছেন। তারা চাইছেন সিটিং সার্ভিস ফিরে আসুক। একই সঙ্গে বিআরটিএ থেকেও তাদের সিটিং সার্ভিসের অনুমোদন দেওয়া হোক। এর পাশাপাশি বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম সীমিত করা হোক। বিআরটিএ সূত্র জানিয়েছে, পরিবহন মালিকদের পক্ষ থেকে এমনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সিটিং সার্ভিসের অনুমোদন দেওয়া এবং বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম সীমিত করা না হলে পরিবহনে চলমান কৃত্রিম সংকটকে আরও প্রকট করে তোলা হবে।

সিটিং সার্ভিস বন্ধে পিছু হটল সরকার: অভিযান ১৫ দিন স্থগিত

রাজধানীতে যাত্রীদের ভোগান্তি দূর করতে পাঁচ দিনেও পর্যাপ্ত বাস-মিনিবাস নামাতে পারেনি সরকার। এই অবস্থায় গতকাল বুধবার বাস-মিনিবাসের সিটিং সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল বুধবার পরিবহন মালিক, পরিবহন বিশেষজ্ঞ, যাত্রী ও নাগরিক প্রতিনিধি এবং বিআরটিএ চেয়ারম্যান-সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এলেনবাড়িতে বিআটিএর সদর কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় বিআরটিএ চেয়ারম্যান মশিয়ার রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন, "রাজধানীতে সিটিং সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিন সিটিং সার্ভিসের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযান চালানো হবে না"। এসময় বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, জনদুর্ভোগ কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিআরটিএর চেয়ারম্যান বলেন, যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী সিটিং সার্ভিসের একটি আলাদা কাঠামো তৈরি করা যায় কি না, তা পর্যালোচনা করা হবে।

জনভোগান্তির নেপথ্যে সরকারি দলের নেতারা

বাস-মিনিবাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষায় থাকতে হবে না, ভাড়া কমে যাবে- এমন আশ্বাস দিয়ে মালিক সমিতি সিটিং সার্ভিস বন্ধের ঘোষণা দিলেও সেই মালিকেরাই এখন তা মানছেন না। সাধারণ যাত্রী ও যাত্রী অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের অভিযোগ, এই জনভোগান্তির নেপথ্যে রয়েছেন মালিক-শ্রমিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতা ও সমর্থকেরা। ঢাকাসহ সারা দেশের মালিক সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান ও ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) আওয়ামী লীগের নেতা খোন্দকার এনায়েত উল্লাহ। আর দেশের পরিবহনশ্রমিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। এই মন্ত্রীর পারিবারিক মালিকানায় ঢাকায় কনক পরিবহন নামে বাস চলে।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল ২০১৭; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৯ এপ্রিল ২০১৭; ইত্তেফাক, ১৯ এপ্রিল ২০১৭; প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ও ২০ এপ্রিল ২০১৭

দুই দফায় গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

১৯ মাসের ব্যবধানে আবারো গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। এবার দুই দফায় তা কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ১লা মার্চ ও ১লা জুন দু'দফায় নতুন এ মূল্য কার্যকর করা হবে। গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসে এক চুলায় সবচেয়ে বেশি বাড়ানো হয়েছে। যা বিদ্যমান মূল্যের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। আর দুই চুলায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। যানবাহনে ব্যবহৃত রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাসের (সিএনজি) দাম ১ মার্চ থেকে হবে প্রতি ঘনমিটারে ৩৮ টাকা, ১ জুন থেকে হবে ৪০ টাকা। এ ছাড়া বিদ্যুৎ খাতে ১ মার্চ থেকে ২ টাকা ৯৯ পয়সা, ১ জুন থেকে ৩ টাকা ১৬ পয়সা। ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ১ মার্চ থেকে ৮ টাকা ৯৮ পয়সা, ১ জুন থেকে ৯ টাকা ৬২ পয়সা। সার, ১ মার্চ থেকে ২ টাকা ৬৪ পয়সা, ১ জুন থেকে ২ টাকা ৭১ পয়সা। শিল্প খাতে ১ মার্চ থেকে ৭ টাকা ২৪ পয়সা, ১ জুন থেকে ৭ টাকা ৭৬ পয়সা। চা বাগান, ১ মার্চ থেকে ৬ টাকা ৯৩ পয়সা, ১ জুন থেকে ৭ টাকা ৪২ পয়সা। এ ছাড়া বাণিজ্যিক খাতে ১ মার্চ থেকে সর্বোচ্চ ১৪ টাকা ২০ পয়সা, ১ জুন থেকে ১৭ টাকা ০৪ পয়সা। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিইআরসি সম্মেলন কক্ষে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণের ঘোষণা দেন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১ আগস্ট গ্যাসের দাম গড়ে ২৬ দশমিক ২৯ শতাংশ বাড়িয়েছিল বিইআরসি। বর্তমানে প্রতি ঘনমিটারে ১১ দশমিক ৩৬ টাকা দিচ্ছেন গ্রাহকরা। সূত্র জানায়, গ্যাসের নতুন মূল্যবৃদ্ধির ফলে বছরে ৪ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব বেশি আসবে।

দ্বিতীয় ধাপের দাম হাইকোর্টে ছয় মাসের জন্যে স্থগিত

বাংলাদেশের সরকার দুই ধাপে গ্যাসের দাম বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার একটি ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছে হাই কোর্ট। ভোক্তা সংগঠন ক্যাবের এক রিট আবেদনের প্রেক্ষাপটে এই আদেশ দিয়েছে আদালত।

লোকসানে নেই কোনো প্রতিষ্ঠান

গ্যাসের দরবৃদ্ধির কারণ হিসেবে এসব কোম্পানির লোকসানসহ আইওসির কাছ থেকে গ্যাস ক্রয় বাবদ দেয়া ভর্তুকিতে সরকারের ব্যয় সমন্বয়ের কথা জানিয়েছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। যদিও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, গ্যাস উৎপাদনে লোকসানে নেই এসব প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করছে রাষ্ট্রায়ত্ত তিন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন অ্যান্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)। কয়েক বছর ধরেই মুনাফার ধারায় রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। সরকারের সংশিষ্ট পক্ষ বলছে, আইওসি গ্যাসের ব্যয় বেশি থাকায় তা পোষাতে হয় ভর্তুকি দিয়ে। কিন্তু তথ্য বিশেষণে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে (আইওসি) প্রতি ঘনমিটার গ্যাস কিনতে হয় প্রায় ৩ টাকা ১০ পয়সায়, যেখান থেকে পেট্রোবাংলার প্রাপ্য অংশ ১ টাকা ৬ পয়সা। এর বিপরীতে ঘাটতি থেকে যায় প্রায় ২ টাকা ৩ পয়সা। কিন্তু দেশীয় তিনটি কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাস ও আইওসি গ্যাসের ওপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ও মূসকসহ অন্যান্য চার্জ যোগ করে তা বিক্রি হয় প্রতি ঘনমিটার গড়ে ৬ টাকা ৩৮ পয়সায়। ফলে আইওসি থেকে যেটুকু বেশি দামে কেনা হয়, গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা আদায়ের পর তা মিটিয়েও বিপুল পরিমাণ অর্থ পেট্রোবাংলার কাছে জমা থাকে। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরও পেট্রোবাংলার কাছে জমা হবে ২ হাজার ৬০১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

গ্যাসের বর্ধিত দাম প্রত্যাহারের দাবি: বাম দলগুলোর কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ডাকা হরতালের সময় মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও জলকামান থেকে পানি ছুঁড়েছে পুলিশ। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই হরতাল কর্মসূচি চলে। দুপুরে হরতালের সময় রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে হরতাল পালনকারীদের মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। সেখান থেকে সাতজনকে আটকও করা হয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। পরে রাবার বুলেট ছুঁড়ে সেখান থেকে হরতাল সমর্থকদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। গত ১৫ মার্চ একই দাবিতে বাম দলগুলোর জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। এ সময় কাঁদানে গ্যাসের শেল, জলকামানের পানি ও ফাঁকা গুলি ছুড়েছে পুলিশ। আন্দোলনকারীরাও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন পুলিশের দিকে। ১৫ মার্চ বুধবার দুপুরের দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব ও সংলগ্ন এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। হামলার প্রতিবাদে ১৬ মার্চ বিকেল চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ১৫ এপ্রিল ঢাকায় গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে দলগুলো।

বিদ্যুতের দামও বাড়বে: জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

বিভিন্ন খাতে গ্যাসের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোয় ভোক্তা অধিকারকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে এবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। তিনি বলেন, "বিদ্যুত খাতে গ্যাসের প্রাইসটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতের দামও আমরা অ্যাডজাস্ট করতে চাই"।

তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০১৭; ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ; ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৭, বণিক বার্তা; মানব জমিন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭;সমকাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; বিবিসি বাংলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: পোসকো দাইয়ুর সঙ্গে পেট্রোবাংলার চুক্তি সই

রফতানির সুযোগ রেখে গভীর সমুদ্রের ১২ নম্বর বকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি পোসকো দাইয়ু করপোরেশনের সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (পিএসসি) সই করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা। গত ১৪ মার্চ রাজধানীর পেট্রোসেন্টারে এই চুক্তি সই হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ আইনে (বিশেষ বিধান) প্রতিযোগিতা ছাড়া দাইয়ুকে এই কাজ দেয়া হয়েছে। চলমান গণপ্রতিবাদের মুখেই বিতর্কিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হল। দাইয়ুর সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষেত্রে সংশোধিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি)-২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষে প্রাপ্ত গ্যাস রফতানির সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি অনুসন্ধানকাজ পরিচালনা ও গ্যাস বিক্রির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক এবং করপোরেট ট্যাক্স মওকুফের সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ কোম্পানিকে। এছাড়া কস্ট রিকভারি হিসেবে উৎপাদিত গ্যাস থেকে ৭০ শতাংশ খরচ তুলে নেয়ারও সুযোগ পাচ্ছে দাইয়ু। উলেখ্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগের নানা সময়ে গ্যাস রফতানী না করার অঙ্গীকার করেছিলেন।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, দাইয়ু তার অংশের গ্যাস তাদের কাঙ্ক্ষিত দামে পেট্রোবাংলার কাছে বিক্রির প্রস্তাব দেবে। পেট্রোবাংলা ওই দামে কিনতে রাজি না হলে তারা তা এলপিজিতে পরিণত করে বোতলের মাধ্যমে অথবা এলএনজি জাহাজের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রি করতে পারবে। দেশে চরম গ্যাস সংকট থাকা সত্ত্বেও রফতানির সুযোগ রাখা এবং কর অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। কারণ দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলোয় মজুদ কমে আসা এবং নতুন গ্যাসকূপ আবিষ্কার না হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি দামে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রকল্প নিয়েছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের সুযোগ রেখে চুক্তি করা আত্মঘাতী এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন তারা। এ বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম বলেন, "গ্যাস নেই বলে আমরা কয়লা, ব্যয়বহুল এলএনজি এমনকি পারমাণবিক বিদ্যুতের দিকে যাচ্ছি। এ অবস্থায় রফতানির সুযোগ রেখে গ্যাস অনুসন্ধান করতে দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ আগামী ৫০ বছরে এমন কোনো পরিস্থিতি হবে না যে, বাংলাদেশ গ্যাসে উদ্বৃত্ত অর্জন করে তা রফতানির পর্যায়ে পৌঁছবে"। চুক্তি অনুসারে ডিএস-১২-তে প্রথমে পাঁচ বছর, পরে অনুমতি সাপেক্ষে আরো তিন

বছর কাজ করতে পারবে দাইয়ু। উলেখ্য, গভীর সমুদ্রের ১২ নম্বর ব্লকটি মিয়ানমারের গ্যাস ব্লক এডি-৭-এর থালিন-১-এ গ্যাসকূপের ঠিক পাশেই অবস্থিত। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারের এ গ্যাসক্ষেত্রে সফল অনুসন্ধান চালায় পোসকো দাইয়ু। এছাড়া মিয়ানমারের গভীর সমুদ্রে এ-১ ও এ-৩ গ্যাস ব্লক দুটি থেকে গ্যাস উত্তোলনের কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৩ সাল থেকেই বক দুটি থেকে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন করছে পোসকো।

তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, মার্চ ১৪, ২০১৭, মার্চ ১৫, ২০১৭*

সৌরবিদ্যুৎ এশিয়ায় সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাংলাদেশে

দেশে প্রতি মাসে গড়ে ৬৫ হাজার নতুন সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) স্থাপন হচ্ছে। জাতীয় সঞ্চালন লাইন পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, এমন অঞ্চলে এরই মধ্যে বসেছে প্রায় ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেম। যদিও এ বিদ্যুৎ পেতে গ্রাহককে পরিশোধ করতে হচ্ছে উচ্চমূল্য। এ মূল্য পার্শ্ববর্তী দেশ, এমনকি এশিয়ার মধ্যেও সর্বোচ্চ। আর উচ্চমূল্যে সোলার সিস্টেম বিক্রির কারণে অতিরিক্ত মুনাফা করছে এ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসাহিত করতে কাজ করছে সরকারি সংস্থা সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা)। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে প্রতি কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সৌর প্যানেল স্থাপনে ব্যাটারিসহ ব্যয় হয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি ওয়াটের দাম পড়ে ১২০ টাকা। কিন্তু বাজার ঘুরে দেখা যায়, এ দামের তিন-চার গুণ বেশি মূল্যে প্যানেল বিক্রি হচ্ছে। সোলার পাওয়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হোম সিস্টেমসহ প্রতি ওয়াটের দাম রাখা হচ্ছে ৩৭৫ টাকা। যদিও এর চেয়ে অনেকে কম দামে সোলার হোম সিস্টেম কিনতে পারছেন এশিয়ার অন্যান্য দেশের গ্রাহকরা। ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিসসহ (আইইইএফএ) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতে ২৫০ ওয়াটের একটি সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি হয় ৮ হাজার ৫১৪ রুপিতে। এ হিসাবে প্রতি ওয়াটের দাম পড়ে ৩৪ রুপি বা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪১ টাকা। পাকিস্তানে ৪৫০ ওয়াটের সিস্টেম স্থাপনে ব্যয় হয় ৫৩ হাজার রুপি। এ হিসাবে প্রতি ওয়াটের দাম দাঁড়ায় ১১৭ রুপি, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ৯০ টাকা। এছাড়া থাইল্যান্ডে দেড় হাজার ওয়াটের একটি সোলার প্যানেলের জন্য গ্রাহককে ব্যয় করতে হয় ৫৬ হাজার বাথ, ওয়াটপ্রতি যার দাম পড়ে ৩৮ বাথ বা ৮৬ টাকা। দামের তুলনামূলক এ চিত্রই বলছে, বাংলাদেশে সৌর প্যানেলের সরকার ঘোষিত দামই এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

সৌরবিদ্যুতের জনপ্রিয়তা ও প্রযুক্তি সহজলভ্যতার কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন সোলার প্যানেল উৎপাদন হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে সাত-আটটি প্রতিষ্ঠান সোলার মডিউল উৎপাদন করছে। পাশাপাশি ভারত ও চীন থেকে প্রয়োজনীয় সোলার মডিউল আমদানি করা হচ্ছে। এসব মডিউল রহিমআফরোজ, টিএমএসএসসহ প্রায় ৫৬টি সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। গ্রাহক পর্যায়ে এ প্যানেল স্থাপনে অর্থায়ন সুবিধা দেয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)। পরে তা গ্রাহকের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে তুলে নেয় প্রতিষ্ঠানটি। অতিরিক্ত দামে সোলার মডিউল বিক্রির কারণে বড় অংকের মুনাফা করছে বিতরণকারী কোম্পানি। পাশাপাশি মুনাফা করছে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানও।

তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, মার্চ ১৫, ২০১৭*

সংরক্ষিত বন ভাগ করে বিদ্যুৎ লাইন!

চট্টগ্রাম জেলার একমাত্র প্রাকৃতিক ও সংরক্ষিত বন রামগড়-সীতাকুণ্ড বনভূমির মধ্য দিয়ে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করতে যাচ্ছে সরকার। এতে ৬৩ হেক্টর বনভূমির বৃক্ষ কাটা পড়বে। ওই বনের মধ্যে রয়েছে দেশের প্রায় বিলুপ্ত হওয়া সবচেয়ে দীর্ঘতম বৃক্ষ।

সীতাকুণ্ডের ওই বনভূমির ওপর প্রায় এক যুগ ধরে গবেষণা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক কামাল হোসেন। তিনি বন বিভাগের পক্ষ থেকে ওই বন সংরক্ষণের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি বলেন, "ওই বনভূমিতে অনেক দুর্লভ বৃক্ষ ও বন্য প্রাণী আছে, যা আমরা এখনো পুরোপুরি জানি না। সেখানে বেশ কিছু চমৎকার ঝরনা ও পাহাড়ি বন আছে, যা বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বনের মাঝখান দিয়ে দীর্ঘ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে বনটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এতে বন্য প্রাণীর বিচরণ বাধাগ্রস্ত হবে। তাই সরকারের উচিত হবে ওই বনের বাইরে দিয়ে সঞ্চালন লাইনটি নিয়ে যাওয়া"। এই সংরক্ষিত বনের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার সবচেয়ে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকা বাড়ৈয়োরঢালা জাতীয় উদ্যান ও হাজারিখিলে বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য অবস্থিত। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই বনভূমির মধ্যে দেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ 'বইলাম' রয়েছে। এক-দেড় শ ফুট উচ্চতার এই বৃক্ষটি দেশের বেশির ভাগ এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে এখন শুধু চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বনভূমিতে রয়েছে। একইভাবে সবচেয়ে বড় আকৃতির বুনো ছাগল (প্রায় ৩০ কেজি), বনমোরগ ও বনবিড়ালের বসতি রয়েছে। আরও রয়েছে লতাগুল্ম ও হরেক রকমের কীটপতঙ্গের বসতি। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ছাড়াও এসব প্রাণী ও বৃক্ষকে জিনগত সম্পদ (জেনেটিক রিসোর্সেস) হিসেবে সংরক্ষণ করা জরুরি। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, বন আইন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এ ধরনের বন্য প্রাণী ও বৃক্ষ আছে এমন এলাকা সংরক্ষণ করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০১৭*

আনোয়ারায় চীনা ইকোনমিক জোন: অনুমোদন ছাড়াই কাটা হচ্ছে পাহাড়

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের (সিইআইজেড) জন্য পাহাড় কেটে সড়ক বানাচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ জায়গা পাহাড় ও টিলায় পরিবেষ্টিত হলেও এগুলো কাটা নিয়ে এখন পর্যন্ত পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমোদন বা ছাড়পত্র পায়নি বেজা। এ নিয়ে একটি চিঠি দেয়া হলেও তা এখনো পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। এ অবস্থায়ই পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় চীন সরকারের সঙ্গে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। পরে চীনা রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় চায়না হারবার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের সঙ্গে এ নিয়ে 'এগ্রিড টার্মস' স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চলটির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ)

করেছে প্রাইসওয়াটারহাউজকুপারস।

জানা গেছে, আনোয়ারার সিইআইজেড প্রকল্পে মোট জমির পরিমাণ ৭৭৪ একর, যার মধ্যে ৩২৭ একরই পাহাড় ও টিলা পরিবেষ্টিত। ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পাহাড় কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেবল জাতীয় অপরিহার্য স্বার্থের ক্ষেত্রেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনসাপেক্ষে পাহাড় কাটার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়ার পরও প্রয়োজন হয় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের। অথচ অনুমোদন বা ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই আনোয়ারা-২ নামে পরিচিত এ অর্থনৈতিক অঞ্চলটির পাহাড় কাটা শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, প্রকল্পের ৪৮৩ দশমিক ৫৫ একর জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন। এর মধ্যে ৩২৩ দশমিক ৫৪ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া, বাকি ১৬০ একর কৃষিজমি। প্রকল্পে খাসজমির পরিমাণ ২৯০ দশমিক ৮৭ একর। অন্যদিকে প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়দের ক্ষতিপূরণের টাকাও এখনো বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ না করেই প্রকল্পের সড়ক নির্মাণ ঠিক হচ্ছে না বলে মনে করছেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা। এদিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ না পেলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দেশনা অনুযায়ী আবাদী জমির চাষ বন্ধ রেখেছে জমির মালিকরা। এতে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা। প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা জানান, কেউ কেউ পেলেও এখনো ক্ষতিপূরণের শতভাগ অর্থ পাননি অনেকেই। ফলে প্রকল্পের সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে যাননি তারা। তবে অর্থ না পেলেও প্রকল্প এলাকা থেকে যেকোনো সময় উচ্ছেদের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে চলতি বোরো মৌসুমে চাষ না করে অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে পাহাড়ি সমতলে অবস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিগুলো। জানা গেছে, পানির উৎস না থাকায় প্রকল্পটির পানির চাহিদা পূরণ করা হবে দুটি বোর ওয়েল বসিয়ে।

তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, ২৭ মার্চ, ২০১৭*

প্রতিবেশীর চেয়ে ৩ গুণ দামে বিক্রি হচ্ছে কেরোসিন

বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে এখনো দেশের ২৮-৩০ শতাংশ মানুষ। এদের বেশির ভাগই দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষ। বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের কাজকর্মে কেরোসিনের আলোই যাদের ভরসা। কিন্তু এ জ্বালানিটিও কিনতে হচ্ছে উচ্চমূল্যে-প্রতিবেশী দেশের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি দামে। প্রতিবেশী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কেরোসিনের মূল্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কলকাতায় জ্বালানিটি বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার ১৯ দশমিক ৯২ রুপি বা বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৪ টাকা ৫২ পয়সায়। মুম্বাইয়ে বিক্রি হচ্ছে আরো কমে-বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৩ টাকা ১০ পয়সায়। এছাড়া চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ১৩ দশমিক ৬০ রুপি বা ১৩ টাকা ৭৪ পয়সা। অথচ বাংলাদেশে একই জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার ৬৫ টাকায়। যদিও কোথাও কোথাও লিটারপ্রতি ৭২-৭৫ টাকাও পরিশোধ করতে হচ্ছে গ্রাহককে। শুধু ভারত নয়, প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের চেয়েও বাংলাদেশে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কেরোসিন। বর্তমানে শ্রীলংকায় আবাসিকে প্রতি লিটার কেরোসিন বিক্রি হচ্ছে ৪৪ শিলং (২৩ টাকা ২০ পয়সা) ও শিল্পে ৮৮ শিলংয়ে (৪৬ টাকা ৩৯ পয়সা)। পাকিস্তানে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ৪৪ রুপি বা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা। এছাড়া নেপালে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ৭৭ দশমিক ৫০ নেপালি রুপি বা ৫৯ টাকা ৬০ পয়সা। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতে থাকায় অন্যান্য জ্বালানি তেলের সঙ্গে কেরোসিনের দামও সমন্বয় করেছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো। ভারতে সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি, শ্রীলংকায় ৯ জানুয়ারি, নেপালে ১ ফেব্রুয়ারি ও পাকিস্তান চলতি মাসের শুরুতে তেলের দাম কমিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *বণিক বার্তা, ৩০ মার্চ, ২০১৭*

পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

৪ জেলায় ১২ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

দেশের চার জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে মার্চের শেষ ১০ দিনে কমপক্ষে ১২ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঝিনাইদহে পাঁচজন, চট্টগ্রামে এক পরিবহন ব্যবসায়ী ও তাঁর দুই শ্যালক, নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা থেকে তিন যুবক এবং রাজশাহীর বাগমারা থেকে এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ১০ দিনের ব্যবধানে বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচ ব্যক্তিকে পুলিশ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এর মধ্যে কোটচাঁদপুর উপজেলা থেকে তিনজন ও সদর উপজেলা থেকে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যক্ষও রয়েছেন। সংশিষ্ট পরিবারগুলোর স্বজনেরা বলছেন, তাঁরা কোথাও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান পাচ্ছেন না। থানায় খোঁজ নিতে গেলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না।

ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে হত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রাম নগরের চন্দনপুরার বাসা থেকে কেন্দ্রিয় ছাত্রদলের সহ সম্পাদক নুরুল আলম নুরুকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে তুলে নিয়ে যায় একদল লোক। পরে কর্ণফুলী নদীর তীরে তার লাশ পাওয়া যায়। আগের রাত ১২টার দিকে পুলিশের পোশাক পরে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

আশকোনায় গ্রেপ্তারের পর মৃত যুবকের নিখোঁজের জিডি উধাও

আশকোনায় আত্মঘাতী জঙ্গির হামলার মধ্যে সন্দেহভাজন হিসেবে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারের পর মারা গেছেন যে যুবক, তিনি নিখোঁজ দাবি করে যে জিডিটি পরিবার করেছিল, তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হানিফ মৃধা নামে ওই যুবক ও তার এক বন্ধুকে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ডিবি পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয়েছিল দাবি করে কয়েকদিন পর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিল তার পরিবার। এরপর তার সন্ধান না মেলার মধ্যে শনিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে মর্গে একটি লাশ যায়, যার নাম হানিফ মৃধা বলে জানায় র‍্যাব। শুক্রবার ঢাকার আশকোনায় ব্যারাকে আত্মঘাতী হামলার পর ওই যুবককে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তারের কথাও তার মৃত্যুর একদিন পরে জানায় র‍্যাব। বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। এরপর হানিফ মৃধার ভাই আব্দুল হালিম মৃধার জিডির খবর নিতে গেলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মুহা. সরাফত উলাহ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "গত ১ মার্চ থেকে করা জিডির বই হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তা পাওয়া যাচ্ছে না"। ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা হালিম মৃধার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় করা জিডির নম্বর ১৩৫।

তিন মাসে বন্দুকযুদ্ধ ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ৫৯ : আসক

বন্দুকযুদ্ধ ও পুলিশ হেফাজতে তিন মাসে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতের মধ্যে র‍্যাবের হাতে সাতজন, পুলিশের হাতে ৩১ জন এবং গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ছয়জন মৃত্যুবরণ করেন। এ ছাড়া, পুলিশের গুলিতে আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়। গত ৩১ মার্চ মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, একই সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ২৫ জনকে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে চারজন ফিরে এসেছেন এবং একজনকে মৃত উদ্ধার করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বলে আসক জানিয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার (বিএমবিএস) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মার্চ মাসে ক্রসফায়ারে মৃত্যু হয় ২১ জনের। এর মধ্যে পুলিশের হাতে নিহত হয় ১৮ জন এবং র‍্যাবের হাতে নিহত তিনজন। ৩০ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৫ জন নারী ও শিশু। সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে ১২০ জন।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০১৭; সমকাল, ৩০ মার্চ, ২০১৭; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৯ মার্চ, ২০১৭; বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ এপ্রিল, ২০১৭*

জঙ্গি আস্তানায় পরিচালিত 'অপারেশন টোয়াইলাইট' ও 'অপারেশন হিট ব্যাক'

অপারেশন টোয়ালাইটঃ কোনো জঙ্গি জীবিত উদ্ধার হয়নি

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানাধীন শিববাড়ি এলাকায় 'আতিয়া মহল' নামে পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় জঙ্গিরা অবস্থান করছে বলে ২৩ মার্চ (বৃহস্পতিবার) মধ্যরাতে খবর পায় পুলিশ। ২৪ মার্চ সকাল ৮টার দিকে আতিয়া মহলের ভেতর থেকে বাইরের দিকে গ্রেনেড ছোড়া হয়। ফলে ওই বাড়িতে অভিযান চালাতে ঢাকা থেকে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট সোয়াটকে পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। আর অভিযানে নেতৃত্ব দিতে রাত ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) প্রধান মনিরুল ইসলাম। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয় সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ইউনিট। ২৫ মার্চ শনিবার ভোরে আতিয়া মহলে অভিযান শুরু করে সোয়াট ও সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো বাহিনী। শনিবার সকাল থেকে অভিযান শুরুর পর দুপুর নাগাদ ভবনের ভেতর থেকে ৭৮ বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে আনে। অভিযান নিয়ে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আতিয়া মহল থেকে আধা কিলোমিটার দূরে সেনাবাহিনীর প্রেস ব্রিফিং চলাকালে পাঠানপাড়া এলাকার জামে মসজিদের কাছে দুই দফা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ছয়জন নিহত হন। আহত হন র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানসহ অন্তত ৫০ জন। বিস্ফোরণের ঘটনার পর 'আতিয়া মহল' আশপাশের এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে সাংবাদিকসহ সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। ২৮ মার্চ রাত আটটায় সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত প্রেসব্রিফিংয়ে অপারেশন টোয়ালাইট এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফখরুল আহসান। আতিয়া মহলে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে চার জঙ্গি নিহত হয়, এদের একজন নারী।

অপারেশন হিট ব্যাকঃ বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর

জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে গত ২৮ মার্চ মঙ্গলবার রাত থেকে মৌলভীবাজার পৌরসভার বড়হাট এলাকায় একটি বাড়ি এবং শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে খলিলপুর ইউনিয়নের সরকার বাজার এলাকার নাসিরপুর গ্রামে আরও একটি বাড়ি ঘিরে রাখে পুলিশ ও সিটিটিসি। ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ১৮ মিনিটে অপারেশন হিট ব্যাক শুরু করে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সোয়াট টিম। টানা ৩৪ ঘণ্টা ঘিরে রেখে 'অপারেশন হিট ব্যাক' নামে অভিযান চালানোর পর গত ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকাল পৌনে চারটার দিকে অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ওই বাসা থেকে সাতটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, বুধবার বিকেলেই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এরা নিহত হয়। উদ্ধার হওয়া সাতটি লাশের মধ্যে চারটিই শিশু। এর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী শিশুর বয়স কয়েক মাস বলে জানিয়েছেন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকেরা।

তথ্যসূত্রঃ *কালের কণ্ঠ, ২৭ মার্চ ২০১৭; ডেইলি সিলেট, ২৮ মার্চ ২০১৭; প্রথম আলো, ০১ এপ্রিল ২০১৭; বাংলা ট্রিবিউন, ১০ এপ্রিল ২০১৭*

বিএনপির দুই মেয়র ফের বরখাস্ত

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলকে ফের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত ২ এপ্রিল রোববার স্থানীয় সরকার বিভাগ পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। আরিফুল ও বুলবুল দুজনই বিএনপির নেতা। প্রথমবার সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার প্রায় দুই বছর পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে আরিফুল ও বুলবুল মেয়রের দায়িত্ব নিতে নিজ নিজ নগর ভবনে যান। মেয়রের চেয়ারে বসতে না বসতেই তাঁরা ফের সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। আরিফুলের বিরুদ্ধে একটি মামলায় গত ২২ মার্চ সুনামগঞ্জের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সম্পূরক অভিযোগপত্র গৃহীত হয়। এ কারণে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, একটি মামলায় বুলবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ায় তাঁকেও সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ০২ এপ্রিল ২০১৭*

উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণের গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য সরানোর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী

উচ্চ আদালত প্রাঙ্গণের সামনে স্থাপিত ভাস্কর্য সরানোর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, "আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা এখানে থাকা উচিত নয়"। ভাস্কর্যটি সেখান থেকে অপসারণে প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। গত ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে নিজের সরকারি বাসভবন গণভবনে কওমি মাদ্রাসার আলেমদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ আশ্বাস দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এদিন গণভবনে গিয়েছিলেন হেফাজতে ইসলামের আমির ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) সভাপতি আলামা শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিসহ প্রায় তিনশ আলেম। হেফাজতে ইসলাম শুরু থেকেই ভাস্কর্য সরানোর দাবি করে আসছিল। আলেমদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের হাইকোর্টের সামনে গ্রিক থেমেসিসের এক মূর্তি লাগানো হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেও এটা পছন্দ করিনি। কারণ গ্রিক থেমেসিসের মূর্তি আমাদের এখানে কেন আসবে? এটাতো আমাদের দেশে আসার কথা না। আর গ্রিকদের পোশাক ছিল একরকম, সেখানে মূর্তি বানিয়ে তাকে আবার শাড়িও পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও একটা হাস্যকর ব্যাপার করা হয়েছে"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এটা কেন করা হলো, কারা করল, কিভাবে আমি জানি না।

ইতিমধ্যেই আমাদের প্রধান বিচারপতিকে আমি এই খবরটা দিয়েছি এবং খুব শিগগিরই আমি ওনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বসব। আলোচনা করব এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা এখানে থাকা উচিত নয়"। শেখ হাসিনা বলেন, "আমি আপনাদের বলব আপনারা ধৈর্য ধরেন। এটা নিয়ে কোনো হই চই নয়। একটা কিছু যখন করে ফেলেছে সেটাকে আমাদের সরাতে হবে। সেটার জন্য আপনারা একটুকু ভরসা অন্তত রাখবেন যে, এ বিষয়ে যা যা করার আমি তা করব"।

দেশের সব 'মূর্তি' অপসারণ চায় হেফাজতে ইসলাম

গত ১২ এপ্রিল হেফাজতের কেন্দ্রিয় সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "হাইকোর্টের সামনের মূর্তির ব্যাপারে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে নির্দিষ্টভাবে বলেছি। তিনি তা অপসারণের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা চাই ভবিষ্যতে 'ভাস্কর্য'র নামে কোন 'মূর্তি' স্থাপিত না হয় এবং যতগুলো 'মূর্তি' আছে তা অপসারণ করা হোক"। ১৩ দফা দাবিতে ২০১৩ সালে রাজধানীর শাপলা চত্বরে অবস্থান নিয়ে রাজধানী অবরোধ করেছিল হেফাজতে ইসলাম। সেই দাবিগুলোর মধ্যে ৭ নম্বর দাবি ছিল, "মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা"।

বিকল্প প্রস্তাবনা

মন্ত্রিপরিষদ সভায় এক অনির্ধারিত আলোচনায় হাইকোর্টের সামনে স্থাপিত জাস্টিসিয়া বা ন্যায় বিচারের প্রতীক গ্রিক দেবী থেমিসের ভাস্কর্যের প্রসঙ্গটি তোলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। এসময় প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়াই হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টের সামনে একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। আর এটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে জাতীয় ঈদগাহ থেকেও চোখে পড়ে"। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমি গত শনিবার (১৫ এপ্রিল)জাজেস কমপ্লেক্স উদ্বোধনের পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এ বিষয়ে একান্তে কথা বলেছি। তাকে জানিয়েছি, ভাস্কর্যটি দর্শনীয় হয়নি। গ্রীক দেবীকে শাড়ি পরানো হয়েছে। এটি নিয়ে বিতর্কও উঠেছে। হয় এটি হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে ফেলুন অথবা এমনভাবে রিপ্লেস (স্থানান্তর) করুন বা ঢেকে দিন যাতে এটি জাতীয় ঈদগাহ থেকে দেখা না যায়। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন"।

তথ্যসূত্রঃ *প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০১৭; চ্যানেলআই অনলাইন, ১২ এপ্রিল ২০১৭; দৈনিক আজাদী, ১৮ এপ্রিল ২০১৭*

সেনা নির্যাতনে নান্যাচর কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী রমেল চাকমা'র মৃত্যু

রাঙামাটির নান্যাচরে গত ৫ এপ্রিল বুধবার সকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক অন্যায়ভাবে আটক ও অমানুষিক নির্যাতনে গুরুতর আহত নান্যাচর কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং পিসিপি নান্যাচার উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রমেল চাকমা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৯ এপ্রিল বুধবার দুপুরে মারা গেছেন। রমেল চাকমা নান্যাচর উপজেলার পূর্ব হাতিমারা গ্রামের কান্তি চাকমার ছেলে। তিনি আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীও, ডানচোখে তিনি দেখতে পান না। এ বছর ২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন এবং নান্যাচর উপজেলা পরিষদ এলাকায় বাসা ভাড়ায় থেকে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। আটকের দিন পরীক্ষা না থাকায় রমেল চাকমা তরিতরকারি ও প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে নান্যাচর বাজারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাসায় ফেরার পথে উপজেলা পরিষদ এলাকা থেকে আনুমানিক সকাল ১০টার সময় সেনাবাহিনীর নান্যাচর জোনের মেজর তানভির-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য তাকে আটক করে। গত ২৩ জানুয়ারি চাঁদার দাবিতে দুটি মালভর্তি ট্রাকে আগুন লাগানোর অভিযোগে তাকে আটক করা হয় বলে নিরাপত্তা বাহিনী সূত্র জানায়। আটকের পরে দিনভর তার উপর অমানুষিকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। এতে রমেল চাকমা গুরুতর অসুস্থ ও অজ্ঞান হয়ে পড়লে সেনা সদস্যরা সন্ধ্যায় তাকে থানায় হস্তান্তরের চেষ্টা করে। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ তার শারীরিক অবস্থা দেখে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর সেনারা তাকে স্থানীয় উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে সেখানে ভর্তি না করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণের পরামর্শ দেয়। সেনারা সেদিনই তাকে মুমুর্ষ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে সেনা নজরদারি ও পুলিশী পাহারায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেলেন।

উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রাঙামাটি জেলা অফিসে গিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের বরাবরে তার বাবা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করে এর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। "আমার পুত্র রমেল চাকমা চলতি শিক্ষা বর্ষের এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তার পরীক্ষার রোল নং-৩২৬১৭৯। সে নানিয়াচর কলেজ থেকে এবারে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। গতকাল ০৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ বুধবার নানিয়াচর বাজারে হাটবার ছিল। ঐ দিন পরীক্ষা না থাকায় সে বাজারে বাজার করতে গিয়েছিল। তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে যে, সে নানিয়াচর উপজেলা কার্যালয়ের দিকে যাবার পথে পার্শ্বোক্ত সেনা ক্যাম্পের [নানিয়াচর জোন, ৭ ই. বেঙ্গল রেজিমেন্ট, রাঙামাটি) সদস্যগণ আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় তাকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে কোন প্রকার বাছ-বিচার না করে নির্বিচারে বেপরোয়াভাবে মারধর করেন। তাদের আঘাতে রমেল চাকমা অজ্ঞান হয়ে পড়লে নিকস্থ থানায় সৈন্যরা হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রমেলের অবস্থা বেগতিক দেখে থানা হস্তান্তর গ্রহণে অস্বীকার জানান। পরে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার জন্য সৈন্যরা নিয়ে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে নাই।" তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "পার্শ্বোক্ত সেনা ক্যাম্পের সৈন্যরা বিনা কারণে এমন অমানুষিক নির্যাতন করায় আমার পুত্রের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া তার শিক্ষা জীবনে দীর্ঘ মেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অবশেষে তার অপূরণীয় ক্ষতি হলো।" তিনি আরো বলেন, "বিনা দোষে একজন পরীক্ষার্থী ছাত্রকে বেপরোয়া শারীরিক নির্যাতনে আমি একজন অভিভাবক হিসেবে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত। অমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে প্রায়ই সৈন্যরা ঘটনা ঘটাচ্ছেন বলে ধারণা করা যেতে পারে।"

তথ্যসূত্রঃ *ডেইলি সিএইচটি, ২০ এপ্রিল ২০১৭; সিএইচটি নিউজ, ২০ এপ্রিল ২০১৭*

রানা প্লাজার শ্রদ্ধার্ঘ্যে জলকামান!

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা নামের ভবন ধসের ঘটনায় পাঁচটি পোশাক কারখানার শ্রমিকসহ এক হাজার ১৩৬ জন শ্রমিক-কর্মচারী নিহত হন। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে পঙ্গু হওয়ার পাশাপাশি নিখোঁজ হন বহু শ্রমিক। গত ২৪ এপ্রিল ছিল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার চতুর্থ বছর। দিনটিতে সকাল থেকেই ধসে পড়া

ভবনটির স্থানে নির্মিত বেদীতে শ্রদ্ধা জানাতে আসতে শুরু করেন ওই দুর্ঘটনায় নিহত, আহত ও নিখোঁজদের স্বজনরা। আশপাশের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকসহ শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনও শ্রদ্ধা জানাতে আসে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তার কড়াকড়িতে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাদের এক মূহূর্তও দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি বেদীর সামনে। বেদীর আশপাশে থাকা পুলিশ সদস্যরা বেদীতে ফুল দিয়ে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করার জন্য তাড়া দিতে থাকেন সবাইকে। এসময় শ্রমিক অধিকার নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধা জানাতে এলে তাদেরও মুহূর্তের মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বেদীর কাছ থেকে। কয়েকটি সংগঠন মানববন্ধন করতে চাইলেও তাদের তা করতে দেওয়া হয়নি। কোনও কোনও সংগঠনের নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত জনতার প্রতি বক্তব্য রাখতে চাইলে তাতেও বাধা দেওয়া হয়। খুব দ্রুত বক্তব্য শেষ করে ওই স্থান ছাড়তে তাদের বাধ্য করে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এমন আচরণে তাই শ্রদ্ধা আর শোক ছাপিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখিয়েছেন নিহতের স্বজনরা। রানা প্লাজার স্থানটিতে সকাল থেকেই অবস্থান নেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে পুলিশ ও সাভার থানা পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। ওই স্থানে নির্মিত বেদীটিও ঘিরে রাখে তারা। নিরাপত্তা বাহিনীর বাড়তি সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াও ঘটনাস্থলে রাখা ছিল জলকামান। বেদীর চারপাশে কাউকে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না পুলিশ সদস্যরা- নিরাপত্তার এই বাড়াবাড়িতে ক্ষোভ আর বিরক্তির কথা জানিয়েছেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা স্বজন ও শ্রমিকরাও। তারা বলেন, "রানা প্লাজার এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিল্ডিংয়ের মালিক সোহেল রানা আর এখানকার কারখানাগুলোর মালিকরা। সরকার তাদের না ধরে আমাদের কেন শ্রদ্ধা জানাতেই বাধা দিচ্ছে?"

রানা প্লাজা হত্যাকাণ্ড নিয়ে ওয়েবসাইট উদ্বোধন

গত ২২ এপ্রিল গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি উদ্যোগে Rana Plaza Massacre: An Anthology নামে ওয়েবসাইট (www.athousancries.org) উদ্বোধন করা হয়। ২০১৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ '২৪ এপ্রিল: হাজার প্রাণের চিৎকার' এর ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে ওয়েবসাইটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করেন রানা প্লাজার নিহত শ্রমিক সাগরিকার বোন বকুল খাতুন। রানা প্লাজা এবং বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন ও ইতিহাস দুনিয়ার পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই এই ওয়েবসাইটের লক্ষ্য।

রানা প্লাজা ধসের ৪ বছর: দুই মামলারই সাক্ষ্য থেমে আছে

বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিল্পভবন দুর্ঘটনায় ১ হাজার ১৩৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুর বিচার হয়নি চার বছরেও। সাভারে রানা প্লাজা ধসের এই ঘটনায় সরকারি কর্মকর্তাদের আসামি করা না-করা নিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট করার পর এখন আর মামলা এগোচ্ছে না। সাক্ষ্য গ্রহণই শুরু করা হয়নি। আর এই সাক্ষ্য গ্রহণ না হওয়ার বিষয়টি জানেই না অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়। জানা গেছে, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় করা হত্যা মামলার এ পর্যন্ত চার দিন তারিখ পড়লেও সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। ৪১ আসামির মধ্যে ৩ জনের ক্ষেত্রে মামলার কার্যক্রমের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। তবে পাঁচজনের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ থাকার কথা জানিয়েছেন বিচারিক আদালতের সরকারি কৌঁসুলি। এর আগে ছয়জন সরকারি কর্মকর্তাকে আসামি করার অনুমতি না পাওয়ার কারণে তিন বছর ঝুলে ছিল এই মামলা। সে সময় জনপ্রশাসন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুক্তি ছিল যারা বড় অপরাধ করেননি, তাঁদের আসামি করার অনুমতি তাঁরা দিতে পারবেন না। শ্রম আইন অনুযায়ী তাঁরা দোষী নন এবং দায়দায়িত্ব নেই বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার মঞ্জুরি দেওয়া হয়নি। তবে সরকারের অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আসামি করে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালতও ওই অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে বিচার শুরু করেন। কিন্তু এখন তাঁরা সবাই জামিনে আছেন। একই ঘটনায় ইমারত আইনে করা অপর মামলাটির সাক্ষ্য গ্রহণ হচ্ছে না জেলা ও দায়রা জজ আদালতে তিন আসামির করা রিভিশন অনিষ্পন্ন থাকায়। রানা প্লাজার হত্যা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ থাকার বিষয়টি জানেন না রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি গতকাল রোববার প্রথম আলোকে বলেন, যে নিম্ন আদালতে মামলাটি বিচারাধীন, সেই আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) কিংবা হাইকোর্টের যেসব বেঞ্চ থেকে স্থগিতাদেশ হয়েছে, সেখানে কর্মরত আইন কর্মকর্তাদের কেউ তাঁকে স্থগিতাদেশের বিষয়টি জানাননি। এটি জানলে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হতো। তিনি বলেন, শিগগিরই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। উলেখ্য, ২৫ এপ্রিল সাভার থানায় দুটি মামলা হয়। এর মধ্যে অবহেলাজনিত মৃত্যু চিহ্নিত হত্যা মামলাটি করে পুলিশ। ইমারত নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণের অভিযোগে অপর মামলাটি করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। এ ছাড়া নিহত পোশাকশ্রমিক জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী শিউলি আক্তার খুনের অভিযোগ এনে আদালতে নালিশি মামলা করেন। সাভার থানা-পুলিশের করা মামলার সঙ্গে এই মামলাটির তদন্ত আদালতের নির্দেশে একসঙ্গে করা হয়। এ ছাড়া দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ভবন নির্মাণের অভিযোগে আরেকটি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এই মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষ হয়েছে। আদালত ও সংশিষ্ট সূত্র বলেছে, তদন্ত শেষে গত বছরের ১ জুন হত্যা এবং ইমারত নির্মাণ আইনের মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। অভিযোগপত্রে হত্যা মামলায় রানা প্লাজার কর্ণধার সোহেল রানা, কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাসহ ৪১ জনকে এবং ইমারত নির্মাণ আইনের মামলায় সোহেল রানাসহ ১৮ জনকে আসামি করা হয়। ১৪ জুন অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে ইমারত নির্মাণ আইনের মামলার বিচারকাজ শুরু হয়। আর হত্যা মামলায় বিচারকাজ শুরু হয় ১৮ জুলাই। হত্যা মামলার আসামিদের মধ্যে সোহেল রানা, সাভার পৌরসভার সাবেক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ও সাইট ইঞ্জিনিয়ার সরোয়ার কামাল কারাগারে এবং ৩০ জন জামিনে আছেন। এক আসামি আবু বকর সিদ্দিক মারা গেছেন এবং অপর সাতজন পলাতক। অপর মামলায়ও ওই তিনজন কারাগারে আছেন। পলাতক আছেন চারজন। বাকিরা জামিনে রয়েছেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, "আমাদের দেশে স্থায়ী কোনো প্রসিকিউশন সার্ভিস নেই। ফলে যাঁদের এ মামলাগুলো দেখভাল করার কথা কিংবা উচ্চ আদালতের কী আদেশ হলো, সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষে যেসব আইনি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সেগুলো নেওয়া হয় না বলে বহু মামলা ঝুলে যায়। আর মামলা ঝুলে গেলে পাঁচ-সাত বছর পর সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে আসামিরা সহজে খালাস পেয়ে যান"।

রানা প্লাজার আহত শ্রমিকের ৪২ শতাংশ এখনো বেকার

ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং পুনর্বাসন ঠিকভাবে না হওয়ায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের ৪২ দশমিক ২ শতাংশ এখনো চাকরি পাননি। এ ছাড়া আহত শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতির

উন্নতি না হওয়ার কারণেও তারা কর্মহীন রয়েছেন। সাভারের রানা প্লাজা পোশাক কারখানা ট্র্যাজেডির চার বছরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গত ২২ এপ্রিল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'অবিস্মরণীয়, অমার্জনীয় : রানা প্লাজা' নামক গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয়। দুর্ঘটনায় আহত ১ হাজার ৪০৩ জন শ্রমিক ও নিহত শ্রমিক পরিবারের ৬০৭ সদস্যের ওপর গবেষণা চালায় অ্যাকশনএইড। এ গবেষণায় দেখা যায়, ৫৭ শতাংশ আহত শ্রমিক বিভিন্ন চাকরি বা আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে ৪২ দশমিক ২ শতাংশ এখনো বেকার। আবার আহত বেকার শ্রমিকদের মধ্যে ২৬ শতাংশ জীবিকার জন্য কোনো পরিকল্পনাই করতে পারছেন না।

৩০ শতাংশ শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যায়

২০১৭ সাল পর্যন্ত আহতদের মধ্যে ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ শারীরিকভাবে সেরে উঠেছেন। মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশের অবস্থা। ১৩ দশমিক ১ শতাংশের শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। এছাড়া আহতদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৩০ দশমিক ৮ শতাংশের মানসিক আঘাত রয়ে গেছে। স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন ১২ শতাংশ মানুষ। আহত শ্রমিক বাকি বিলাহ বলেন, "দেড় বছর হাসপাতালে ছিলাম। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিছুটা সুস্থ হয়ে আমি একটি কারখানায় কাজ নিলাম। তবে শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় তারা আমাকে চাকরিচ্যুত করেছে। আমি এখন কিভাবে চলব?" অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির বলেন, "চার বছর পরও এত বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের এই অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। গবেষণার এই ফলাফল প্রমাণ করে দুর্ঘটনার পর যে উদ্যোগ ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে তারা আরও দারিদ্রতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের যেভাবে আর্থিক সহায়তা ভেঙে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে তারা ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পরিকল্পনাও করতে পারছেন না"।

ক্ষতিপূরণ পাননি বহু শ্রমিক

ভবন ধসের পর নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে একটি কমিটি গঠন করে দেন উচ্চ আদালত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এম আকাশের নেতৃত্বের সেই কমিটি, ক্ষতিপূরণের যে সুপারিশ দিয়েছিলেন, এখনও শুরু হয়নি তার শুনানি। তাই অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গেই কমিটির প্রধান বললেন, এই ঘটনার মীমাংসা হোক, এটা কেউ চায় না। তাই এ দশা। এদিকে হতাহতদের ক্ষতিপূরণের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মিলে আইএলওর নেতৃত্বে ৩০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয় (৩২০ কোটি টাকা)। সেখানে প্রায় ২৪ মিলিয়ন ডলার জমা পড়েছে। অর্থাৎ এখনও ঘাটতি আছে প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেন সূত্রে জানা যায়, রানা প্লাজার পাঁচ কারখানায় পোশাক তৈরি করতে এমন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯। এর মধ্যে ১৬ প্রতিষ্ঠান তহবিলে অর্থ দেয়নি। আর যেসব ক্রেতা প্রতিষ্ঠান দিয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই অল্প পরিমাণে। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রাইমার্ক, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতিষ্ঠানটি দিচ্ছে ৯০ লাখ ডলার। এই অর্থ দিয়ে রানা প্লাজার দ্বিতীয় তলায় থাকা নিউ ওয়েভ বটমস লিমিটেডের ৫৮০ জন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহ্বায়ক হামিদা হোসেন বলেন, "শ্রমিকরা এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি এটা সত্য ও সঠিক। হাইকোর্ট একটি প্যানেল গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকরা কে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার স্কেল তৈরি করে। কিন্তু এরপর আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি"। আহত শ্রমিক নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, "চিকিৎসার জন্য এখন আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। দুর্ঘটনার পর প্রথম ৬ থেকে ৮ মাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের কিছু সহযোগিতা করেছিল। এখন আর আমাদের কেউ খোঁজ নেয় না। আমরা শুধু ভালো চিকিৎসা চাই। আমি তো ভালো ছিলাম। আজ শারীরিকভাবে অক্ষম। আমি আমার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ চাই। একটুও অনুকম্পা চাই না। ৫ হাজার কিংবা ৫০০ টাকা এবং একটি বিরিয়ানির প্যাকেট আমরা চাই না। মূল্যায়ন চাই"।

তথ্যসূত্রঃ বাংলা ট্রিবিউন, ২৪ এপ্রিল ২০১৭; বহুমাত্রিক, ২৩ এপ্রিল ২০১৭; প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০১৭; আমাদের সময়, ২৩ এপ্রিল ২০১৭; জনকণ্ঠ, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে সমঝোতা, চুক্তি ও ঋণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট ২৪টি সমঝোতা স্মারক, ১১টি চুক্তি ও ২টি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর স্বাক্ষর করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামো বিষয়ক সমঝোতা স্মারক।

২) বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা এলওসি সম্প্রসারণের সমঝোতা স্মারক।

৩) ভারত প্রজাতন্ত্রের লাইনহাউসেস অ্যান্ড লাইটশিপ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল বিভাগের মধ্যে বাংলাদেশে নৌ চলাচল বাড়ানোর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক। স্মারক অনুযায়ী নৌ চলাচলের সুবিধা সম্প্রসারণে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত বাংলাদেশিদের প্রশিক্ষণ দেবে।

৪) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে উপকূল ও প্রটোকল রুটে যাত্রী ও জাহাজ চলাচল নিয়ে সমঝোতা স্মারক ও এসপিও।

৫) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তজুড়ে ৬টি সীমান্ত হাট প্রতিষ্ঠার সমঝোতা হয়।

৬) কৌশলগত ও কার্যক্রমগত সমীক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধিত সহযোগিতার জন্য ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ, ওয়েলিংটন (নীলগিরি), তামিলনাড়ু, ভারত এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

৭) ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, নয়াদিলি, ভারতের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত সমীক্ষার সমঝোতা স্মারক।

৮) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সমঝোতা স্মারক।

৯) গোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপ (জিসিএনইপি), ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি, ভারত প্রজাতন্ত্র এবং বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (বিএইসি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বাংলাদেশে পরমাণু বিদ্যুৎ প্লান্ট

প্রকল্পে সহযোগিতা।

১০) তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিকস ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ভারত প্রজাতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও গণযোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১১) ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপনসেন্স টিম, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ভারত প্রজাতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সরকারের কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিভিশন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সমঝোতা স্মারক।

১২) দ্বিপক্ষীয় বিচার বিভাগীয় সহযোগিতা নিয়ে ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৩) ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি, ভারত এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে ভারতে বাংলাদেশি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধিসূচক কর্মসূচি নিয়ে সমঝোতা স্মারক।

১৪) মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নে পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষেত্রে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জিএসআই) এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশের (জিএসবি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৫) ভারত প্রজাতন্ত্রের জাহাজ চলাচল এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল রুট নিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে দইখোয়া এবং আশুগঞ্জ থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত চলাচল বিষয়ক সমঝোতা স্মারক।

১৬) গণমাধ্যম নিয়ে ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক।

১৭) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকারের 'থার্ড লাইন অব ক্রেডিট' সম্প্রসারণের সমঝোতা স্মারক।

১৮) পেট্রোবাংলা ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের মধ্যে রিগ্যাসিফাইড লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস সরবরাহ ও পাইপলাইন অবকাঠামো উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক।

১৯) তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি, চেন্নাই ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটির মধ্যে সহযোগিতা সমঝোতা স্মারক।

১৯) বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সের মেডিক্যাল সার্ভিস অধিদপ্তর ও ভারতের টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের মধ্যে একটি সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক।

২০) বাংলাদেশের কন্টেইনার কোম্পানি ও ভারতের কন্টেইনার কোম্পানির মধ্যে সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক।

২১) বাংলাদেশ ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করার সমঝোতায় এসেছে ভারতের সাথে।

২২) ভারতের বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনের সাথে খুলনার নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির সমঝোতা স্মারক।

২৩) পেট্রোবাংলা ও পেট্রোনেটের সাথে এলএনজি টার্মিনাল ব্যবহার বিষয়ক সমঝোতা স্মারক।

২৪) ভারতের রিলায়েন্স পাওয়ারের সাথে বাংলাদেশের কুতুবদিয়ায় ৫০০ এমএমসিএফডি ক্যাপাসিটির এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের সমঝোতা স্মারক।

চুক্তি

১) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে পরমাণু জ্বালানি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের চুক্তি।

২) রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বিষয়ক ইন্টার এজেন্সি অ্যাগ্রিমেন্ট চুক্তি হয়েছে ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ও বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মধ্যে।

৩) ভারত প্রজাতন্ত্রের পরমাণু জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (এইআরবি) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরমাণু জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (বিএইআরএ) মধ্যে পরমাণু নিরাপত্তা ও তেজস্ক্রিয় সুরক্ষা চুক্তি।

৪) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অডিও-ভিজ্যুয়াল সহ-উৎপাদন নিয়ে চুক্তি।

৫) রেগুলেশন অব মোটর ভেহিকল প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক (খুলনা-কলকাতা রুট) এবং চুক্তির এসওপি বিষয়ক চুক্তি।

৬) ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বাংলাদেশে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের অর্থ চুক্তি।

৭) ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি করে।

৮) রামপালে ২ X ৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য মৈত্রী থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট এক্সিম ব্যাংক থেকে ১৬০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণের চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

৯) ঝাড়খণ্ডে আদানি পাওয়ার লিমিটেডের পাওয়ার পান্ট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি ও বাস্তবায়ন চুক্তি।

১০) মহেশখালীতে ভারতের রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের সাথে ৭৫০ মেগাওয়াট রিগ্যাসিফাইড এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি।

১১) ভারতের নুমালিগর রিফাইনারি লিমিটেডের সাথে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি।

ভারতীয় ঋণ

১) বাংলাদেশ ইতিপূর্বে ভারত থেকে প্রথম ধাপে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল ১.৭% সুদে। দ্বিতীয় ধাপে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন হয় ১% সুদে। গত এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গেলে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ১% সুদে ঋণচুক্তি করে। এর পূর্বে বাংলাদেশ ঋণ নিলে ঋণের ৭৫% ভারতীয় পণ্য ক্রয়ে বাধ্য ছিল। তৃতীয় ধাপের ঋণে ভারতীয় পণ্য কেনার এই বাধ্যবাধকতা ৬৫%-এ নামানো হয়।

সূত্র : ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১১ এপ্রিল ২০১৭

[সংকলন: কল্লোল মোস্তফা, মোশাহিদা সুলতানা, অনুপম সৈকত শান্ত, দেবাশীষ সরকার, তন্ময় কর্মকার, ফাহিমা কানিজ লাভা]